৮.০৩ ষড়যন্ত্রের খপ্পরে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৮.০৩ ষড়যন্ত্রের খপ্পরে দস্যু বনহুর – Bangla Library

ষড়যন্ত্রের খপ্পরে দস্যু বনহুর –১২৩

বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর শান্ত লাগছে। তাকালো বনহুর তার অনুচরবর্গের মুখের দিকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো দাইমার মুখে, বললো–তোমাদের স্নেহ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে দাইমা।

না। তোমার কর্তব্য এখন বৃদ্ধা মায়ের পাশে থেকে তার সেবাযত্ন করা। আমি আশা করছি তুমি তোমার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। কথাগুলো বলে বৃদ্ধা দাইমা তার ঘোলাটে চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর সেই দৃষ্টির কাছে নিজেকে সংযত রেখে বললো–ঠিক আছে, তুমি যা চাচ্ছো– তাই হবে।

রহমান বলে উঠলোসর্দার তা কি করে হয়! আপনার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফসল সব যে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

দাইমার কথা আমাকে রাখতেই হবে রহমান, না হলে আমি আমার নীতিচ্যুত হবো। রহমান, তুমি থাকবে আস্তানার সবকিছুর দায়িত্বে।

সর্দার!

হাঁ রহমান।

দরবারকক্ষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো।

মশালের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে এলো। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

দাইমা লাঠিতে ভর করে বেরিয়ে গেলো।

নূরী ছুটে গেলো তার পাশেদাইমা, তুমি একবার আমার কথা ভাবলে না? ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো কি করে? তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও দাইমা!

না, তা হয় না, তা হয় না। ওকে যেতেই হবে ওর মায়ের পাশে।

কিন্তু জানো তো মায়ের পাশে ওর নিরাপদ স্থান নয়। সর্বদা পুলিশ মহল সন্ধান চালিয়ে চলেছে, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের লক্ষ্যস্থান চৌধুরীবাড়ি।

এত ভয় পেলে চলবে না। আল্লাহ রক্ষা করবেন। কথাগুলো বলে বৃদ্ধা তর তর করে বেরিয়ে গেলো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নূরী।

*

মা গো, তোমার পাশে ফিরে এলাম, আর যাবো না। মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো বনহুর।

মরিয়ম বেগম চোখের চশমাটা ভাল করে চোখে লাগিয়ে বললেন-সত্যি! সত্যি আর তুই যাবি না? আমাকে ছেড়ে যাবি না?

না। আমাকে তুমি স্থান দেবে না মা?

ওরে পাগল ছেলে, কোথাও যার স্থান নেই, মায়ের কোলে তার স্থান আছে। মায়ের কাছে সন্তান নির্দোষ।

মাগো, পারবে আমাকে ধরে রাখতে? চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রতি মুহূর্তে পুলিশ মহল আমার সন্ধান করে ফিরছে......।

তোকে আমি আমার কোলে লুকিয়ে রাখবো বাপ।

পারবে মা?

পারব।

বনহুর মায়ের কোল ঘেঁষে বসলো।

কতদিন পর মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছে সে, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো। সত্যি সে যদি এমনি করে মায়ের পাশে থাকতে পারতো। কতদিন বনহুর তার আস্তানায় শুয়ে ভেবেছে মায়ের কথা। এখন তিনি বৃদ্ধা, না জানি কখন কোন মুহূর্তে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাবেন। সন্তান হয়ে সে মায়ের কোনো উপকারে এলো না। নিজেকে বনহুর অপরাধী মনে করতো, আজ মায়ের সান্নিধ্যে এক অনাবিল আনন্দ লাভ করে সে।

মায়ের কাছাকাছি বসে অনেক কথা বলে বনহুর।

মরিয়ম বেগম চোখে ভাল দেখেন না, তাই তিনি বনহুরকে আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে বলেন–ওরে সরে আয়। আমার আরও কাছে সরে আয়।

এই তো তোমার পাশে একেবারে কাছাকাছি আছি মা।

মনির! বাবা মনির! সত্যি তুই আর আমাকে ফেলে যাবি না?

থাকবো বলেই তো এসেছি মা।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি কথাটা বলতে বলতে হাতে খাবারের থালা নিয়ে শাশুড়ির কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা। স্বামী এবং শাশুড়ির সম্মুখে খাবারের

থালা রেখে বললো খাও, মা আর ছেলে মিলে খাও। নতুন ধরনের জিনিস এনেছি।

শাশুড়ি বললেন–খাবার টেবিলে দিলেই তো পারতে।

না, ওকে তোমার কাছাকাছি থাকতে হবে। এখানেই খাবে ও। মা, আজ থেকে সবাইকে বারণ করে দিয়েছি কেউ তোমার ঘরে আসবে না।

কিছুটা খাবার মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলে বনহুর—-আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইলেই কি পারবে মনিরা?

পারবো।

পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কতদিন আমাকে ধরে রাখবে তোমরা?

যতদিন দয়াময়ের রহমত হবে। বললো–মনিরা।

মরিয়ম বেগম শান্ত দৃষ্টি মেলে পুত্র এবং পুত্রবধুর দিকে তাকালেন।

*

গভীর রাতে মনিরার ঘুম ভেঙে গেলো।

কিন্তু একি, পাশে ও কই! মনিরা ভাল করে হাতড়ে দেখলো। ঘুমাবার সময় ওর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলো মনিরা। স্বপ্ন নয় সত্য, স্বামীর পাশে সে শুয়েছিলো তবে গেলো কোথায়! মনিরা শয্যা ত্যাগ করে লাইট জ্বাললো।

চমকে উঠলো মনিরা, পাশের জানালা খোলা।

বুঝতে বাকি রইলো না মনিরার।

পালিয়েছে তার প্রিয়তম। অভিমানে, দুঃখে মনটা তার ভারে উঠলো।

কিছুক্ষণ মুক্ত জানালা পথে অন্ধকারময় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো মনিরা। তারপর ফিরে এলো বিছানার পাশে। কে যেন তার কানের কাছে বললো

—ওকে ধরে রাখতে চাইলেই কি পারবে! ও যে তোমার একার নয়, সারাবিশ্বের মানুষের……

মনিরা বলে উঠলো—সে আমার স্বামী……

কেউ যেন বললো—স্বামী-সন্তান-ভাই কাউকেই কেউ ধরে রাখতে পারে না মনিরা, তুমিও পারবে না…।

আমি তাকে ধরে রাখবো….।

পারবে না…কই পারলে, সে তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেলো।

আর আমি তাকে পালাতে দেবো না। বললো মনিরা।

সত্যি

হাঁ পারবো, পারবো, পারবো…

বনহুর তখন ফিরে এসেছে তার পাশে, বললো সেকি, কি পারবে মনিরা

কে? কে তুমি?

আমাকে চিনতে পারছো না?

কোথায় গিয়েছিলে?

বেশি দূরে নয়, তোমাদের বাগানবাড়িতে

সেখানে কেন? তুমি না বলেছিলে আর তুমি যাবে না? মনিরা স্বামীর জামার আস্তিন দুহাতের মুঠায় চেপে ধরে কথাগুলো বললো।

মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে মাথায় চিবুক রেখে বললো–লক্ষীটি, তুমি তো সব জানো তবু কেন রাগ করে বলোতো?

আমার অলক্ষ্যে কেন তুমি পালিয়ে যাও?

বলেছি তো কত কাজ আছে আমার। তাই মাঝে-মধ্যে আমাকে ছুটি দেবে না?

দেবো কিন্তু আমাকে না বলে পালিয়ে যেতে পারবে না।

বেশ তাই হবে। বনহুর শয্যায় বসে পড়লো।

মনিরা বললো–বাগানবাড়িতে কেন গিয়েছিলে?

সব কথা নাই বা শুনলে মনিরা

না, বলতে হবে তোমাকে।

বাগানবাড়িতে রহমান এসেছিলো।

রহমান! এখানে?

হা।

কেন এসেছিলো সে।

মনিরা, দাইমার কথা রাখতে গিয়ে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আমি জানি দাইমার কথা রক্ষা করলেও আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। আস্তানায় আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে আমার অনুচরবর্গ। রহমান একটি নতুন সংবাদ জানাতে এসেছিলো?

বলতে হবে নতুন সংবাদটি কি বললো মনিরা।

শুনবেই তাহলে?

হাঁ, বলতে হবে এবং মিথ্যা কথা বলা চলবে না।

বেশ শোন। বনহুর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করলো। তারপর একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললো—নতুন এক সংবাদ মনিরা। তোমার না শোনাই ভাল ছিলো।

তুমি তো জানো আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে তুমি কিছু করতে পারোনি, পারবে না।

মনিরার কথায় হাসলো বনহুর। সত্যি নারীজাতি কত সরল-সহজ হতে পারে, স্বামীকে তারা বিশ্বাস করে অন্তর দিয়ে।

বনহুর বললো—-মনিরা! তুমি আমার উপর কোনোদিন বিশ্বাস হারিও না, তাহলে দেখবে সব সুন্দর সচ্ছ পরিষ্কার। মনে রেখো কোনদিন এমন কিছু তোমার অজ্ঞাতে করবো না যা তোমার বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করবে।

আমি জানি।

বনহুর একটু ভেবে বললো—আজ রহমান যে সংবাদ আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলো তা বিশেষ একটি ঘটনা। যা অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ংকর। মিঃ জাফরী কান্দাই আস্তানায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন এ কথা তুমি হয়তো জানো।

শুনেছিলাম তোমার মুখে।

হাঁ, তিনি শহরে ফিরে আসার পর পুলিশমহল তাকে কিছুটা বিব্রত করেছিলো নানা কারণে। তারপর সে ব্যাপার হাল্কা হয়ে এসেছিলো। মিঃ জাফরীর সঙ্গে দস্যু বনহুরের একটা গভীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, এ ঘটনা পুলিশমহল জানার পর এই পরিস্থিতি পাড়ায় কিন্তু। জাফরীর দিক থেকে তারা দোষণীয় কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম না হওয়ায় নিযুপ হয়ে যায়। একটু থেমে বললো বনহুর–জাফরী গত রাতে তার বাসভবন থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। কে বা কারা তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

এই সংবাদ রহমান তোমাকে দিয়েছে।

হা মনিরা, এ কারণে আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

তাহলে তুমি কি……

হ, মিঃ জাফরীকে খুঁজে বের করতেই হবে এবং কে বা কারা তাকে অপরহণ করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

আবার সেই অভিযান? সেই ব্যস্ততা আর দুশ্চিন্তা...

মনি, জানি না কেন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। একটা না একটা ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যায়। জানি না মিঃ জাফরীকে কে বা কারা এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে নাজেহাল-পেরেশান করছে। বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

মনিরা স্বামীকে লক্ষ্য করে বললো—পরে এসব নিয়ে ভেবো, এখন ঘুমাও দেখি।

বনহুর শুয়ে পড়লো।

মনিরা ওর চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

কক্ষের অবস্থা অন্ধকারে মনিরা নির্ণিমেশ নয়নে স্বামীর মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে রইলো। কতকাল পরে নিবিড়ভাবে স্বামীকে পাশে পেয়েছে মনিরা। কত সাধনা, কত বাসনার পর এ দিনটি এসেছে তার ভাগ্যে।

স্বামীর বুকে মাথা রাখলো মনিরা।

অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠলো তার মন।

*

চোখ ও হাতের বাধন খুলে দিলো ওরা।

চোখ মেলে তাকালো মিঃ জাফরী, দুহাতে চোখ রগড়ালেন। প্রথমে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, ভালভাবে তাকাতেই তিনি দেখলেন একটি আবছা অন্ধকার কক্ষ। কয়েকজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বোঝা না গেলেও শরীরের পরিধেয় বস্ত্রে কিছু আঁচ করতে পারলেন। দীর্ঘসময় তিনি পুলিশ বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দূর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। আজ এ মুহূর্তে তার পক্ষে আঁচ করা মোটই কঠিন হলো না এরা কারা।

বললেন মিঃ জাফরী-আমাকে এভাবে পাকড়াও করে নিয়ে আসার কোনো কারণ আমি ভেবে পাচ্ছি না!

একজন বললো—আমরা আপনার দ্বারা একটি কঠিন কাজ সমাধা করে নেবে। যদি আমাদের কথায় রাজি হন তাহলে মুক্তি পাবেন নাহলে……

কি করবে তোমরা? বললেন মিঃ জাফরী।

একবার আমরা আপনাকে হত্যা করেছিলাম কিন্তু আপনি ভাগ্য জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন অনেকেই জানে না বা জানতো না আপনি জীবিত আছেন। বনহুর আপনাকে তার আস্তানায় গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলো।

হাঁ, সে একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। বললেন মিঃ জাফরী।

একজন বলে উঠলো—সেই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিটিকেই আমরা চাই এবং তাকে চাই বলেই আমরা আপনাকে পাকড়াও করে এনেছি।

বনহুরকে তোমরা চাও?

কি প্রয়োজন তার?

আপনি জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আপনার অজানা নেই বনহুরের মূল্য কত। কালাই সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে ব্যক্তি দস্যু বনহুরকে বন্দী করে অথবা হত্যা করে তার মৃতদেহ এনে দিতে পারবে তাকে দুই কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

হাঁ মনে আছে, কান্দাই সরকার একদিন বনহুরের মূল্য দুই লক্ষ টাকা হতে দুই কোটি করেছিলেন। কান্দাই সরকার জানে বনহুরের মূল্য কত……।

বললো লোকটা–মূল্য নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না মিঃ জাফরী। আমরা চাই বনহুরকে এবং আপনি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেন।

তার মানে? বললেন মিঃ জাফরী।

বললো লোকটা–আপনি বন্দী হয়েছেন, আপনাকে অপহরণ করা হয়েছে–একথা আর কেউ জানবার পূর্বে বনহুর জেনে নিয়েছে এবং সে অচিরেই আসবে আপনাকে উদ্ধার করতে। আমরা তাকে সরাসরি বন্দী করতে সক্ষম হবে। অবশ্য আপনাকেই সাহায্য করতে হবে এ ব্যাপারে।

মিঃ জাফরী হতবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন, তাদের মুখমন্ডল স্বল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা না গেলেও তিনি আঁচ করে নিতে পারলেন ওরা কত শয়তান

লোকটা বলেই চলেছে–এমন এক স্থানে আপনাকে আমরা নিয়ে এসেছি যেখানে সোজাসুজি পৌঁছবার কোনো পথ নেই। আপনি সামনে যে দেয়াল দেখতে পাচ্ছেন ঐ দেয়াল সাধারণ নয়। আমরা ঐ দেয়াল সরিয়ে ফেলতে পারি এবং সেখানে একটি মুক্ত গবাক্ষপথ বেরিয়ে আসবে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলেন এবং শুনছিলেন মিঃ জাফরী। তার ঘোলাটে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি নিকুপ ওদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন।

বলছে লোকটা-আপনি সেই মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাকে ডাকবেন। সে আপনাকে দেখতে পেলে সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ছুটে আসবে– তারপর আমরা তাকে বন্দী করতে সক্ষম হবে। আমাদের লোক পর্বতশৃঙ্গে কোনো গোপন স্থানে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করছে। নিশ্চয়ই বনহুর আসবে এবং আপনি আমাদের নির্দেশমত কাজ করবেন। বনহুরকে আমরা বন্দী করতে পারলে আপনি মুক্তি পাবেন নচেৎ আপনাকে আমরা হত্যা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলুন রাজি?

মিঃ জাফরী কোনো জবাব দিলেন না।

অপর একজন বললো—এই দেখুন পিস্তল। আপনি যখন মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াবেন তখন আপনার পাশে আড়ালে আপনার বুক লক্ষ্য করে প্রতীক্ষা করবে এই পিস্তল। আপনার কর্মের ওপর আপনার জীবন নির্ভর করছে।

কথা শেষ হতে না হতে একটা শব্দ শোনা গেলো।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলো সবাই।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে দেখলেন সম্মুখে একটি বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে।

বললো একজন-মিঃ জাফরী, আপনার প্রিয়পাত্র দস্যু বনহুর বিলম্ব করার মত পাত্র নন। তিনি তার অশ্ব নিয়ে সশরীরে হাজির হয়েছেন। যান, ঐখানে গিয়ে দাঁড়ান এবার।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে দেখলেন আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে সয়ে একটু মুক্ত গবাক্ষ বেরিয়ে এলো। আশেপাশে তাকিয়ে তিনি অবাক হলেন লোকগুলো সবাই সরে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই দেখলেন একজন পিস্তলধারী তার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে, লোকটার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বললো সে– আপনি তাকে ইশারা করে ডাকুন। আপনার হাতছানি দেখতে পেলে সে চলে আসবে। নইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন।

মিঃ জাফরী ভালভাবে তাকাতেই দেখলেন জমকালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বয়ং। দস্যু বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে আসছে। বুকটা ধক করে উঠলো তার। একটা অমঙ্গল আশঙ্কা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য দুস্কৃতকারীদের এত প্রচেষ্টা। আজ বনহুরের প্রতি তার হৃদয়ের আকর্ষণ আছে, তার অমঙ্গল কামনা তিনি করতে পারেন না। যদিও একদিন তিনি এই বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মুখ ছিলেন আর আজ মিঃ জাফরী বনহুকে বন্ধু বলে জানেন।

অবশ্য বনহুরও মিঃ জাফরীকে শ্রদ্ধা করে, তার কোনো ক্ষতি সাধন হোক এ কামনা সে করতে পারে না বরং মিঃ জাফরীর বিপদ বনহুর নিজে মাথা পেতে গ্রহণ করতে রাজি আছে।

মিঃ জাফরী ভেবে নিলেন এখন তার কি কর্তব্য। সুদক্ষ পুলিশ প্রধান ছিলেন তিনি। কত অন্যায়কারীকে তিনি সুকৌশলে গ্রেপ্তার করেছেন। কত দুর্দান্ত ডাকাতকে তিনি পাকড়াও করে পুলিশ মহলে সুনাম কুড়িয়েছেন। আর সেই মিঃ জাফরী আজ দুস্কৃতিকারীদের কাছে নাজেহাল হবেন। না, কিছুতেই না, নিজেকেও বাঁচতে হবে, বনহুরকেও বাঁচাতে হবে। বনহুর তাকে চরম বিপদ মুহূর্তে রক্ষা করেছে একবার নয় বহুবার......

পিস্তল হাতে ব্যক্তিটি চাপাকণ্ঠে বললো–ইংগিতে ডাকুন, নিশ্চয়ই সে দেখতে পাচ্ছে বা দেখতে পেরেছে। বিলম্ব করবেন না, ডাকুন......

মিঃ জাফরী দেখলো শুধু সেই ব্যক্তি নয়, তার পাশে আড়ালে আরও অনেকগুলো পিস্তল তাকে লক্ষ্য করে উদ্যত রয়েছে। মিঃ জাফরী মুক্ত গবাক্ষে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন বনহুর অশ্ব ত্যাগ করে টিলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

বুকটা ধক করে উঠলো মিঃ জাফরীর।

তা হলে কি বনহুর আজ সত্যি বন্দী হতে চললো। কি করে বনহুর জানতে পারলো তাকে এই দুর্গম স্থানে আটক করে রাখা হয়েছে। মিঃ জাফরী জানেন বনহুরের অসম্ভব কিছু নয়। কোনো সংবাদ তার কাছে অজানা নেই। বনহুর অনেক এগিয়ে এসেছে।

লোকগুলো বার বার দেয়ালের ছিদ্রপথে দেখে নিচ্ছে বনহুর এখন কত দূরে অবস্থান করছে। ইচ্ছা করলে ওরা তার বুকে গুলি বিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু তা করছে না, হয়তো বা বনহুরকে ওরা জীবন্ত পাকড়াও করতে চায়।

মিঃ জাফরী বাধ্য হলেন বনহুরকে ইংগিতে ডাকতে।

হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলেন তিনি বনহুরকে।

বনহুর দূর থেকে চিনতে পেরেছে মিঃ জাফরীকে। তার চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে, মিঃ জাফরীকে খুঁজে পেয়েছে সে।

বনহুর তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর পৌঁছে গেলো মিঃ জাফরীর বন্দীশালার কাছাকাছি। বনহুর পকেট থেকে সিল্ক কার্ড বের করে ছুঁড়ে দিলো উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মজবুত কড়খানা আটকে গেলো বন্দীশালার মাথায় একটি পাথরখন্ডের সঙ্গে।

এবার বনহুর তর তর করে বেয়ে উপরে উঠে চললো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য দুস্কৃতিকারিগণ জাস্ত নিক্ষেপ করলো তার ওপর।

বনহুর তার হাতের মুঠায় সিল্কড় খানা শক্ত করে ধরে ফেললো। সে এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো। বনহুর বাঁ হাতে কোমরের বেল্ট থেকে সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা খুলে নিয়ে শক্ত জালের রশি কেটে ফেলতে লাগলো।

বেশীক্ষণ সময় লাগলো না বনহুরের জালখানাকে খন্ড খন্ড করতে। বনহুর যখন জালখানা মুক্ত করছিলো তখন বন্দীশালার মুক্ত গবাক্ষ হতে পিস্তল গর্জে

উঠলো, পর পর গুলি নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। বনহুর ততক্ষণে অনেক উপরে উঠে এসেছে।

মুক্ত গবাক্ষের কাছাকাছি প্রায়।

মিঃ জাফরী সব লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তার কোনো উপায় ছিলো না কারণ তার চারপাশে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত ছিলো।

মিঃ জাফরীর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। বনহুর কেন এলো এখানে! এমন বিপদ সে কেন মাথা পেতে গ্রহণ করলো। এই মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটবে। কারণ যেভাবে শয়তান দল তাকে আক্রমণ করেছে এর পর উদ্ধার লাভ একেবারে অসম্ভব। মিঃ জাফরী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সামান্য কয়েকশি মাত্র তফাৎ রয়েছে বনহুর।

মৃত্যুকে পরিহার করে বনহুর রশির শেষ মাথায় চলে এলো এবং অল্পক্ষণে উঠে এলো বন্দীশালার মাথার উপরে।

এবার কয়েকজন দুস্কৃতিকারী তাকে আক্রমণ করলো। দুস্কৃতিকারিগণ বন্দীশালার উপরিভাগে গোপন স্থানে ওৎ পেতে ছিলো এবং লক্ষ্য করছিলো বনহুরকে।

বনহুর যে মুহূর্তে রশি ত্যাগ করে বন্দীশালার উপরিভাগে উঠে পড়লো তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা।

শুরু হলে লড়াই।

ভীষণ ধস্তাধস্তি।

বনহুরের কাছেও পিস্তল ছিলো, কয়েকজন নিহত হলে তার হাতে বনহুরের নিপুণ কৌশলের জন্য একটি গুলীও তার শরীরে বিদ্ধ হলো না। যে মুহূর্তে শত্রুপক্ষের গুলি ছুটে আসে তখনই বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে সরে দাঁড়ায় অথবা উবু হয়ে বসে পড়ে। এ ছাড়াও টিলা আর শৃঙ্গ ছিলো অসংখ্য। বনহুর তারই আড়ালে আত্নরক্ষা করে অগ্রসর হচ্ছিলো।

কয়েকজন নিহত হবার পর দুস্কৃতিকারিগণ বনহুরকে একসঙ্গে ঘিরে ধরলো এবং মরিয়া হয়ে তাকে বন্দী করার চেষ্টা করতে লাগলো।

বন্দীশালাটি ছিলো একটি ছোটখাটো পর্বত এবং পর্বতের অপর পাশে বিরাট একটা ছোট নদী। বনহুর যখন লড়াই করছিলো পর্বতটির ওপাশে একটি খরস্রোতা নদী ছিল। ধস্তাধস্তির সময় বনহুর হঠাৎ পড়ে যায় ওপাশে।

কিন্তু পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে একটি খাড়া পাথর।

ঐ মুহূর্তে একজন দুস্কৃতিকারী বনহুরের হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পড়ে গেলো নদীবক্ষে।

খরস্রোতা নদীবক্ষে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি এলো তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলো ওরা, যারা মিঃ জাফরীর আশেপাশে ছিলো।

মুক্ত গবাক্ষে ঝুলে পড়েছিলো তারা।

মিঃ জাফরী একদন্ড দেরী না করে প্রচন্ড এক ধাক্কায় ফেলে দিলেন একজন দুস্কৃতিকারীকে, পরক্ষণেই অপরজনকে। তারপর বৃদ্ধ জাফরী একজনের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে দিশেহারার মত গুলি ছুঁড়তে লাগলেন এলোপাতাড়ি।

কয়েকজন মৃত্যুবরণ করলো।

মিঃ জাফরীর বাঁ হাতে গুলি লাগলো এবং প্রচুর রক্তপাত হতে লাগলো।

তাকিয়ে দেখলেন একটিও আর অবশিষ্ট নেই। শুধু বন্দীশালার মধ্যে মিঃ জাফরী নিজে দাঁড়িয়ে। তিনি আর বিলম্ব করা উচিত মনে করলেন না। তার আশেপাশে পড়ে আছে দুস্কৃতিকারীদের রক্তাক্ত দেহ। মিঃ জাফরী ভাবতেও পারেননি এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি পূর্বের ন্যায় দুঃসাহসী হয়ে উঠবেন এবং অসীম শক্তির অধিকারী হবেন।

প্রাণভরে তিনি খোদার কাছে শুকরিয়া করলেন। তারপর সেই বন্দীশালার পথের সন্ধানে এগিয়ে গেলেন। দ্রুত খুঁজতে শুরু করলেন কোন্ পথে তাকে এই বন্দীশালায় এনেছিলো ওরা। অনেক সন্ধান করেও পথ পেলেন না মিঃ জাফরী, ফিরে এসে উঁকি দিলেন সেই গবাক্ষে, যে গবাক্ষপথে মিঃ জাফরী বনহুকে

দেখতে পেয়েছিলেন। তখনও বুঝছে সেই সিল্ককর্ডখানা। বনহুর যেটা বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করেছিলো।

ভাবলেন মিঃ জাফরী, যেমন করে তোক ঐ মুক্ত গবাক্ষপথে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঐ ঝুলন্ত রশি বেয়ে নিচে নামতে হবে। কিন্তু কোনোক্রমে যদি হাত ফসকে যায় খোরস্রোতা নদীবক্ষে নিমজ্জিত হবে তার দেহটা। বৃদ্ধ বয়সে সলিল সমাধি......কিন্তু উপায় নেই। এর চেয়ে কি দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হওয়া ভাল ছিলো না। নিজের মনকে প্রশ্ন করেন মিঃ জাফরী। তার হাতের কনুই দিয়ে রক্ত ঝরছে। জামাটা খুলে তিনি জড়িয়ে নিলেন হাতের কনুইটাতে।

মিঃ জাফরী এবার সেই মুক্ত গবাক্ষের উপরে উঠে পড়লেন। তার নাগালের বাইরে ছিলো বনহুরের সেই সিল্ককর্ডখানা। মিঃ জাফরী ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হলো না, রশিখানা নাগাল পেলেন না তিনি।

হতাশ হয়ে বসে পড়লেন মিঃ জাফরী মেঝেতে।

মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কিভাবে তিনি এই দুর্গম বন্দীশালা হতে মুক্তি পাবেন। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছেন মিঃ জাফরী। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। নিদ্রার ঘোরে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখলেন, বার বার হানাদার বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলছে। তাকে হত্যার জন্য আক্রমণ করছে কিন্তু সব বিপদ তার কেটে যাচ্ছে। একটা শব্দ তার মুখ থেকে বের হচ্ছে– হে আল্লাহ তুমি আমাকে রক্ষা করো......সত্যি তাকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। দুস্কৃতিকারিগণ সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশি এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসহায়। তবু কেমন করে তিনি রক্ষা পেলেন সদ্যমৃত্যুর হাত থেকে।

মিঃ জাফরীর নিদ্রা ছুটে গেলো, কারও কণ্ঠস্বর যেন তাকে সজাগ করে তুললো। সচকিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাতেই তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন-বনহুর তুমি! তুমি বেঁচে আছে?

বললো বনহুর—হাঁ। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন আপনার মুক্তির জন্য। নইলে যে খরস্রোতা নদী তাতে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, আপনার শত্রুদল অত্যন্ত চালাক।

মিঃ জাফরী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন–ঐ দেখো বনহুর, ওদের প্রায় সবাই আমার হাতে নিহত হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে আমি বন্দীশালার নিচের নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছি।

বনহুরের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তাকিয়ে দেখলো যে কয়েকটি মনুষ্যদেহ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে বন্দীশালার মেঝেতে। আবছা অন্ধকারে এতক্ষণ তার নজরে পড়েনি। এবার বনহুর বলে উঠলো–মিঃ জাফরী, আপনি এদের হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন?

হাঁ বনহুর। বৃদ্ধ বয়সে এত শক্তি আমি কোথায় পেলাম আমি তা জানি। আংগুল উপরের দিকে তুলে ধরে বললেন–ঐ রহমানুর রহিম আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন।

হাঁ, তাই সত্য মিঃ জাফরী! যাক, পরে সব কথাবার্তা হবে, এখন চলুন এ স্থান ত্যাগ করা যাক। আসুন আমার সঙ্গে।

পথ তুমি চেনো?

পথ খুঁজে বের করেছি মিঃ জাফরী। অত্যন্ত দুর্গম পথ। যে পথ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। মিঃ জাফরী বিপদ আপনার কেটে গেছে, চলুন এখন আপনি নিশ্চিন্ত।

বললেন মিঃ জাফরী-বনহুর, এরা শুধু আমাকে বন্দী করে এনেই ক্ষান্ত হয়নি, এদের উদ্দেশ্য ছিলো তোমাকে আটক করা। এরা জানতো মিঃ জাফরীকে আটক করলেই বনহুর তা জানতে পারবে এবং সে নিজে আসবে তাকে উদ্ধার করতে, সেই মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

যেমন বাঘ শিকারে শিকারিগণ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তেমনি কৌশল গ্রহণ করেছিলো দুস্কৃতিকারিগণ।

হাঁ বনহুর সত্য বলছো।

এরা কারা? বললো বনহুর।

মিঃ জাফরী বললেন–এরা এমন একটা দল যারা সমাজে সাধুতার মুখোশ পরে বেড়ায়। অথচ-এরা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পিছপা হয় না। অর্থের জন্য এরা সবকিছু করতে পারে।

মিঃ জাফরী, আপনি কি মনে করেন এরা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে?

না, এদের এমন কোনো ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে যারা দেশের আমার মনে হচ্ছে।

কারণ?

এদের কথাবার্তায় আমি বুঝেছিলাম।

বনহুর আর মিঃ জাফরী পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। তাদের দৃষ্টি ছিলো সজাগ, কারণ নতুন কোনো বিপদ না এসে পড়ে।

ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো তাই নতুন কোনো বিপদের সম্মুখীন হলো না তারা। বেরিয়ে এলো বনহুর আর মিঃ জাফরী বন্দীশালার বাইরে।

বন্দীশালার নিচে অদূরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে তাজ।

বনহুর শিস দিলো, সঙ্গে সঙ্গে তাজ এগিয়ে এলো প্রভুর আদেশমত।

মিঃ জাফরীর হাত ধরে বনহুর বন্দীশালার উপর হতে নিচে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলো।

বনহুরের অশ্ব তাজ তখন একেবারে নিকটে এসে পড়েছে।

*

মিঃ জাফরী আর বনহুর পাশাপাশি দুটি সোফায় বসেছিলেন। সামনের টেবিলে নানাবিধ খাদ্য, ফলমূল ও পানীয়।

একপাশে একটি সোফায় বসে আছেন মিসেস জাফরী। তার চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস। বয়স হলে কি হবে, মিসেস জাফরীর শরীর সুস্থ সবল এবং তিনি প্রফুল্লমনা মহিলা।

মিসেস জাফরী বললেন– তোমার উপকারের কথা কোনোদিনই ভুলবো না। সত্যি তুমি যে উপকার করেছে তার তুলনা হয় না।

বনহুর হেসে বললো— মিঃ জাফরী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাই আমিও তাকে শ্রদ্ধা করি এবং এ কারণে আমি তার বিপদ মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকতে পারি না।

মিঃ জাফরী খাবার খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন–বনহুর, একদিন তুমি আমার চরম শত্রু ছিলে এবং আমিও তোমার শক্ত ছিলাম, কিন্তু আজ আমরা পরম আত্মীয়ের চেয়ে কম নয়। তোমার মহত্ব আমাকে অভিভূত করেছিলো তাই আমি.......।

স্বামীর কথার মাঝখানে বলে উঠলেন মিসেস জাফরী–তাই উনি তোমার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

হেসে বললেন মিঃ জাফরী—সত্যি তাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন তিনি– সুদীর্ঘ দিন পুলিশমহলে চাকরি করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে এ পৃথিবীর অনেক কিছুই অনুধাবন করবার সুযোগ লাভ করেছি।

থামলেন মিঃ জাফরী।

মিসেস জাফরী বললেন–তুমি কিন্তু কিছু খাচ্ছে না বাবা।

বনহুর তাকালো মিসেস জাফরীর মুখের দিকে, এমন করে একমাত্র তার মা ছাড়া আর কেউ কোনোদিন তাকে দরদ দিয়ে বলেনি। মিসেস জাফরীর মুখে আজ তিনি মেহতা কণ্ঠ শুনতে পেলেন। বনহুর দস্যু ডাকু, তার জীবন এক বিস্ময়। চিরদিন সে সবার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করেছে। আজ পুলিশপ্রধান পত্নী তাকে পরম আদরভরা গলায় খাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে বনহুর মিসেস জাফরীর মুখের দিকে।

মিঃ জাফরী বললেন–দেশ যখন চরম এক মুহূর্তের সম্মুখীন, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যারা সাধুতার মুখোস পরে জনগণের সম্মতি নিয়ে জনগণের দেওয়া নেতৃত্বের আসনে উপবেশন করে, তাদেরই রক্ত শোষণ করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিচ্ছিলো, তখন বাধা এলো আল্লাহর তরফ হতে। জানতাম অন্যায়

কোনোদিন টিকে থাকে না বা স্থায়ী হয় না, তাই চরম শাস্তির সম্মুখীন হলেন বিড়ালতপস্বীরা।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, একটি ফল সে হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মুখে পুরে চিবুচ্ছিলো, মিঃ জাফরীর কথায় বললো—মিঃ জাফরী, আপনি নির্ঘাৎ সত্য কথা বলেছেন। এই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লজ্জা বলে যদি কোনো বস্তু থাকতো তা হলে এরা আত্নহত্যা করে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে যেতো। লজ্জা নেই বলেই এরা গদিচ্যুত হয়ে বিচারকের সামনে করজোরে মিনতি জানাচ্ছে আমরা দোষী নই। বিনা অপরাধে আমাদের কারাবন্দী করা হয়েছে এবং আমাদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে....কথাটা বলে বনহুর হো হো করে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো এরাই দেশ ও দশের ভাগ্যনিয়ন্তা। ছিঃ ছিঃ এদের নাম মুখে আনাও পাপ। নিজেদের স্বার্থে এরা পশুর চেয়েও অধম কাজে লিপ্ত হয়। এরা জানোয়ার! বনহুর এমনভাবে কথাটা বললো তাতে মনে হলো তার মধ্যে যত ঘৃণা ছিলো সব তার শেষ উক্তিতে ঝরে পড়লো।

মিঃ জাফরী বললেন–অর্থের মোহে, স্বার্থসিদ্ধির আশায় এরা গদি নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে। গদিদখল করেই হয়ে উঠে শার্দুলের মত ভয়ংকর। কান্দাই সরকার নতুন পথ বেছে নিয়েছেন, তারা এই সব নেতৃস্থা য়ি ব্যক্তিদের সবাইকে পশুর মত খাঁচায় তুলেছেন। দেশ ও দেশের জনগণকে নিয়ে ভাবছেন......

মিঃ জাফরী, আপনি জানেন, এখনও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনগণের রক্ত শোষণ করে আজও গদিচ্যুত হয়ে দিব্য আরামে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখে এখনও তাদের সাধুতার বুলি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে দয়াময়ের নাম, হাতে তসবি। মিঃ জাফরী, এরা গদিতে সমাসীন থাকা কালে ক্ষমতার বলে লক্ষ নয় কোটি কোটি টাকার মালিক ইমারত, ব্যাংকব্যালেন্স যা করবার করে নিয়েছেন যেন যুগ যুগ চৌদ্দ পুরুষকে অন্নের সংস্থানে ভাবতে না হয়। একটু থেমে বললো বনহুর–লোকসমাজে এরা রেহাই পেলেও উদ্ধার নেই। এদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেই।

মিঃ জাফরী বললেন–আমার অভিজ্ঞতার পরিপেক্ষিতে আমি বলছি প্রায়শ্চিত্ত হবে তবু এদের লজ্জা হবে না। এরা চিরকাল থাকবে এবং অসহায়দের রক্ত শোষণ করে যাবে।

সত্যি মিঃ জাফরী, আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। আপনাকে যারা হরণ করেছিলো তারা এই দলের লোক। এরা গদিচ্যুত হয়ে নিশ্চুপ নেই, এরা গোপনে নানা ধরনের ব্যবসায় লিপ্ত আছে। বড় বড় দুস্কৃতিকারীদের এরা সহযোগিতা করে চলেছে। চোরাচালানী, রাহাজানি, কালোবাজারী এমন কি মানুষ হরণ ব্যাপারেও এরা গোপনে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এতে করে প্রচুর অর্থ আসছে তাদের ভাগ্যে। কাজেই বুঝতে পারছেন এরা নিশ্চুপ নেই......যতই এরা নীতিকথা শোনাক এদের বিশ্বাস করা যায় না।

বনহুর এবার মিঃ জাফরী এবং মিসেস জাফরীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মিঃ জাফরীর বাংলো প্যাটার্নের বাড়িখানার সামনে পাইন আর পামগাছের ঝাড়। দু'পাশে বাগান, জানা-অজানা ফুলের সমারোহ সর্বসময় লেগেই আছে। মিসেস জাফরী বড় সৌখিন মহিলা, বয়স হলে কি হবে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে নানা জাতীয় গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করেন এখনও। তার বড় নেশা এটা, নিজ হাতে গাছ-গাছড়াগুলোর যত্নও করেন তিনি।

মিঃ জাফরীর এসব নেশা নেই।

সারাটা জীবন পুলিশমহলে চাকরি করে মনটা তার কঠিন হয়ে উঠেছে। ফুলের সুগন্ধ এবং সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করে না তবে মুগ্ধ হন তিনি। স্ত্রীর সখের প্রশংসা করেন।

বনহুর যখন মিঃ জাফরীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো তখন মিসেস জাফরীর সৌখিন বাগানবাড়ির একটি পাইন ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ করছিলো কেউ। বনহুর পথে নামতেই আড়াল থেকে সরে গেলো একজোড়া চোখ।

পদব্রজে বনহুরের পথ চলা নতুন নয় তবে মিঃ জাফরীর বাড়িতে পদব্রজে আগমন কিছুটা বিস্ময়কর বটে। মিঃ জাফরী অবশ্য প্রশ্ন করেছিলেন–এভাবে আসাটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?

হেসে বনহুর বলেছিলো–এতো ভেবে চিন্তে চলাফেরা করতে পারছি কই। কতকটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা চলি তাহলে?

এই কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিলো বনহুর।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও কান্দাই শহরের দালান-কোঠার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে শুরু করেছে। পথের ধারে লাইটপোষ্টগুলো এখনও জ্বলে ওঠেনি, তবে আর বেশি বিলম্বও নেই। হয়তো বা এক্ষুণি আলোগুলো অন্ধকারে তারার মালার মত জ্বলে উঠবে।

কিন্তু আশ্চর্য, আলো জ্বললো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠছে ক্রমান্বয়ে। পথের দু'ধারে দোকানগুলোতে আলো জ্বালানো হলো। যানবাহনগুলো দানবের মত দু'চোখে আলো ছড়িয়ে ছুটাছুটি করছে। মন্থরগতিতে পথ চলছে বনহুর।

শরীরে তার স্বাভাবিক প্যান্ট-সার্ট। পায়ে সু। অন্যমনস্ক লাগছিলো তাকে। হয়তো বা মিঃ জাফরীর বাঁশির আলাপ আলোচনা মনে উদয় হচ্ছিলো অথবা ভাবছিলো পৃথিবীটা কত কঠিন আর নির্মম। সবাই স্বার্থের সন্ধানে ছুটছে, উদ্দেশ্যবিহীন একটি লোকও নেই। বাঁচার তাগিদেই যেন এরা পৃথিবীতে এসেছিলো, আবার কাজ শেষে ফিরে যাবে তাদের গন্তব্যস্থানে। কেউ বিনা কারণে একটি কাজও করছে না এমন কি একটি পা চলছে না। বনহুর পথ চলছে, তবে কি তার চলার পেছনেও কোনো উদ্দেশ্য আছে।

আপন মনে হাসলো বনহুর, আজ সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলছে। মিঃ জাফরীর বাসায় গিয়েছিলো অহেতুক, কারণ অবশ্য ছিলো মিঃ জাফরী এখন কেমন আছেন-তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন স্বচক্ষে দেখা দরকার। বনহুর জানতো যানবাহনে যদি সে মিঃ জাফরীর বাসভবনে গমন করে তাহলে হয়তো কোনো অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাই সে পদব্রজেই আজ গমন করেছিলো।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে।

কোনো একটা খালি ট্যাক্সির জন্য মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলো বনহুর সম্মুখের দিকে। পথের দু'ধারে অন্ধকারে লাইটপোষ্টগুলো অশরীরী প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে। কখন যেন নীরবে ওরা হাত বাড়িয়ে দেবে তাদের দিকে।

এ পথে তেমন ভীড় নেই।

মাঝে মাঝে দুএকটা গাড়ি চলে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে।

হঠাৎ বনহুর শুনতে পেলো একটা করুণ আর্তনাদ।

নারীকণ্ঠের প্রতিধ্বনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো এক গলিপথ থেকে শব্দটা ভেসে আসছে, বাঁচাও-বাচাও! বনহুর তাকালো চারপাশে। লক্ষ করলো কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। বেশ কিছু দূরে একটা গলিপথ আছে বলে মনে হলো বনহুরের। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর ছুটে গেলো সেইদিকে। নিঃসহায় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করাই তার জীবনের ব্রত। এমন মুহূর্তে বনহুর চুপ থাকতে পারে না।

বনহুর গলিপথের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। আবার সেই আর্তচিৎকার বাঁচাও……বাঁচাও…..

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষুদে রিভলভারখানা বের করে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো।

কিছুটা এগুতেই বনহুর দেখলো পথের মধ্যে এলোমেলো বেশে একটা নারীমূর্তি বসে আছে। যদিও আবছা অন্ধকার তবু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নারীমূর্তির পরিধেয় বস্ত্র এলোমেলো। চুল এলায়িত, আঁচলখানা লুটোপুটি খাচ্ছে। বনহুর আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলো না।

নারীমূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

বললো–কি হয়েছে।

নারীমূর্তি এবার কথা বললো, রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো সে, তবুও আর্তগলায় বললো— আপনি কে, আমাকে বাঁচান…..

কি হয়েছে বলবেন তোক বললো বনহুর।

নারীটি বললো—আমাকে দুটো লোক জোর করে ধরে এনেছে। মুখে আমার আঁচল গুঁজে দিয়েছিলো তাই চিৎকার করতে পারিনি। আঁচল খুলে ফেলেছি… তাই…

কোথা থেকে আপনাকে জোরপূর্বক ধরে এনেছে।

পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম...।

রাতে আপনি পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

না, সন্ধ্যার পূর্বে, কিন্তু শহরে আলো না থাকায়...

বেশ, পরে সব শোনা যাবে। চলুন, কোথায় যেতে হবে বলুন?

আপনি কে?

বললাম তো সব পরে শুনবেন। নিন উঠুন।

নারীটি আঁচল সংযত করে নিয়ে বনহুরের হাত ধরলো।

নারীটি বললো—আপনার হাতে ওটা কি?

রিভলভার।

রিভলভার! তাহলে আপনিও কি...

না, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আমার ভয় হচ্ছে, আপনি ওটা পকেটে রাখুন।

বেশ রাখছি...বনহুর প্যান্টের পকেটে রিভলভারখানা রেখে বললো–এবার বলুন কোথায় যেতে হবে?

এই, বলবো এবার...পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো তার চারপাশে আবছা অন্ধকার! কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক তাকে ঘিরে ফেলেছে।

বনহুর বিস্মিত হলো, ভাবতেই পারেনি এমন এক অবস্থায় সে পড়বে। মেয়েটি তাহলে বিপদে পড়েনি? দ্রুত একবার মেয়েটির মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকালে

সে যারা তাকে ঘিরে ধরেছে তাদের দিকে। আট-দশ জন লোক, তাদের মুখে মুখোশ, হাতে আগ্নেয় অস্ত্র। আবছা অন্ধকারে বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আন্দাজ করে নিলো এরা নিশ্চয়ই কোনো দুস্কৃতিকারীর দল। তাকে বন্দী করার জন্যই নতুন এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে।

প্রস্তুত হয়ে নিলো বনর।

পকেটে সে হাত প্রবেশ করালো না, কারণ তার চারপাশে আগ্নেয় অস্ত্রধারীরা তাকে বেষ্টন করে আছে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে চাপাকণ্ঠে কেউ বললো—এবার পালাবার কোনো পথ নেই।

অপর একজন বললো–একচুল নড়েছ কি মরেছ!

তৃতীয় ব্যক্তি বললো—এতকাল মানুষের সর্বনাশ করেছে; এবার তোমার উদ্ধার নেই।

বনহুর একটু হেসে বললো–আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও, কারণ আমরা জানি কেউ তোমাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি, হয়তো আমাদের কবল থেকেও তুমি নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার কথা ভাবছো, কিন্তু তা সম্ভব হবে না…কথাগুলো বললো প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় বক্তি বললো—পথের মধ্যে এভাবে বিলম্ব করা মোটেই সমীচীন নয়। এত বড় শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তৃতীয় ব্যক্তি পথের বাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—গাড়িখানা কোথায় আটকে পড়লো কে জানে।

অপর এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো–গাড়ির জন্যে ভেবো না, এক্ষুণি এসে পড়বে। আমাদের ভাগ্য বলতে হবে নইলে এমন সুযোগ কখনও আসে? মিস ঝুমা, এই কৃতিত্ব শুধু আপনার। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির করমর্দন করে লোকটা।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে একবার তাকালো সেইদিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি শব্দবিহীন মোটর এসে থামলো সেখানে। গাড়িখানার রং আবছা অন্ধকারে ভাল বোঝা না গেলেও রং গাঢ় সবুজ অথবা কালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কয়েকজন লোক বনহুরকে ধরে গাড়িতে টেনে তুললো।

বনহুর কোনো বাধা দিলো না।

এরা কারা?

বনহুর আপন মনেই প্রশ্ন করলো।

তাকে জানতে হবে এদের কি উদ্দেশ্য এবং কি করতে চায় এরা।

বনহুরকে পেছনের আসনে বসিয়ে সবাই গাড়িখানার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে উঠে বসলো। সবার হাতেই অস্ত্র। বনহুরের দুপাশে দুজন পিস্তলের মুখ বনহুরের পাঁজরে চেপে ধরে রাখলো, একটু নড়লেই তারা গুলি করবে।

বনহুরকে নিয়ে ওরা গাড়িতে বসার পর গাড়ি ছুটতে শুরু করলো। জনবহুল পথ ছেড়ে ওরা একটি নির্জন পথ বেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। এখন কান্দাই নগরীর রাজপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। লাইট পোষ্টগুলো জ্বলে উঠেছে। তারার মালার মত।

বনহুর ভাবছে অনেক কথা, আর হাত দুখানা এখনো মুক্ত, ইচ্ছা করলে সে সবাইকে কাবু করে গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হতে পারে। কিন্তু সে তা করতে চায় না, দেখতে চায় এরা কারা? মিস ঝুমাই বা কে, কি তার উদ্দেশ্য। গাড়িতে তাকে তুলে নেয়া হয়নি। সে কোথায় গেলো? তবে কি তাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিলো অভিনয় করার জন্য হয়তো বা তাই হবে। বনহুরের কানে এ কথাটি এসেছিলো… মিস ঝুমা, আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে যা আপনার প্রাপ্য।…মৃদু মৃদু হাসে বনহুর। যদি রাতের অন্ধকার না থাকতো তাহলে ওরা মুখোশের ভেতর হতেই তার এ হাসি লক্ষ করতো। ভাবনার মোড় ফিরে যায় বনহুরের, মনিরার কাছে কথা দিয়ে এসেছিলো বেশিক্ষণ বিলম্ব হবে না, ফিরে আসবে সে সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু ফেরা আর তার হলো না। অজানা পথের পথিক এখন সে। কোনো এক ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়েছে সে।

হঠাৎ গাড়িখানা থেমে গেলো।

মস্তবড় একটা গেটের সামনে এসে গাড়িখানা থামলো, সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো মুখোশধারী লোকগুলো।

বনহুরকে তারা পিস্তলের মুখে নামিয়ে নিলো।

বনহুর মুক্তহস্ত থেকেও কোনো রকম চেষ্টা করলো না নিজেকে মুক্ত করতে।

দুষ্কৃতিকারীরা কিছুটা বিস্মিত হয়েছে বটে।

বনহুরকে গ্রেপ্তার তাদের কাছে ভীষণ একটা ব্যাপার ছিলো। সেই কঠিন সমস্যা এত সহজে সমাধান হবে ভাবতেও পারেনি ওরা। বনহুর তাদের কাছে অস্বাভাবিক ব্যক্তি হলেও এই মুহূর্তে তারা তাকে অত্যন্ত সহজভাবে পেলো।

দুস্কৃতিকারিগণ বনহুরকে গাড়ি হতে নামাবার পূর্বে তার হাত দুখানা লৌহশিকলে বেঁধে ফেললো, তারপর তাকে অস্ত্রের মুখে গেটের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

ওরা গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িসহ গেটের সামনের ভাগ মাটির নিচে নেমে গেলো। তারপর পুনরায় স্থানটি যেমন ছিলো তেমনি আকার ধারণ করলো।

বনহুরকে নিয়ে ওরা এমন এক স্থানে এসে দাঁড়ালো যেখানে শুধু একটিমাত্র কক্ষ, সেই কক্ষটি কোনো পাহারারত ব্যক্তির বিশ্রাম কক্ষ ছাড়া কিছু নয়।

ওরা মাত্র দুজন বনহুরের সঙ্গে ছিলো।

তাদের মুখে তখনও মুখোশ রয়েছে। হাতে গুলিভরা পিস্তল। ওরা সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বনহুরকে নিয়ে প্রবেশ করলো, তারপর দেয়ালে একটি সুইচে হাত রাখলো। ধীরে ধীরে মেঝেটা নিচে নামতে লাগলো। গাঢ় অন্ধকার। সেই ছোট কক্ষের মেঝেটা তাদের নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে কোনো গভীর অতলে।

এক সময় থেমে গেলো সমতল মেঝেটা।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে দেখলো এরা অত্যন্ত সজাগ এবং সুচতুর। ভূগর্ভে গোপন আড্ডাখানা আর সেখানেই চলে এদের যত কিছু কুকর্ম! বনহুরকে ওরা হাত দুখানা বাঁধা অবস্থায় একটা খামের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধলো।

কয়েকজন শুভা ধরনের লোক, মুখে মুখোশ পরা-তারা এসে বনহুরের সামনে দাঁড়ালো।

বনহুর লক্ষ করলো, একজন এদের সর্দার অথবা দলনেতা হবে। তার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ সবল সেনা নায়কের মত।

দলনেতা বললো–বনহুর, বহুদিন ধরে তুমি দেশ ও দশের জনগণকে উৎখাত করে আসছো। পুলিশ তোমাকে কয়েকবার গ্রেফতার করেও আটকে রাখতে পারেনি, এমন কি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার হাঙ্গেরী কারাগারও তোমাকে আটক করে রাখতে সক্ষম হয়নি কিন্তু আমরা তোমাকে এমনভাবে আটকে রাখবো যেন তুমি কোনোদিনই আর বের হতে না পারো।

বনহুর শুধু তাকালো ওর মুখোশে ঢাকা মুখখানার দিকে। কোনো জবাব দেয়ার প্রয়োজন সে মনে করলো না, তাই নিশ্চুপ রইলো। প্রথম হতেই বনহুর তেমন কোনো কথা বলেনি দুএক কথা ছাড়া।

এখনও বনহুরকে চুপ থাকতে দেখে দলপতি হেসে বললো–নিরীহ বালকের মত নিশ্চুপ রয়েছো! এবার বুঝতে পারছো সবকিছু তোমার ফাস হয়ে গেছে আমাদের কাছে। সুকৌশলে আটক করেছে আমার দলবল তোমাকে। তবে হ্যাঁ, মিস ঝুমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। বনহুরকে গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব তার......

একজন বললো–হা, মিস ঝুমাই বনহুরকে গ্রেপ্তারের প্রধান সহায়ক। তার কাছে আমরা ঋণী স্যার।

ঠিক আছে, তাকে আমরা খুশি করবো ভালভাবে। হাঁ, সে এখন কোথায়?

বললো লোকটা–মিস ঝুমা এখন তার বাড়িতেই আছে। আমাদের লোক তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। মিস কুমার দাবি, বনহুরকে সে একবার দিনের আলোতে দেখতে চায় এবং এটা শুধু তার দাবি নয়, সখও বলতে পারেন স্যার।

কারণ?

কারণ বনহুর সবার কাছে একটি বিস্ময়। তার সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক আশ্চর্য কাহিনী শুনেছে কিন্তু তাকে স্বচক্ষে দেখেনি কেউ। যারা দেখেছে তারা তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে পারে না। তাই ঝুমাদেবীর দাবি সে বনহুরকে গ্রেপ্তার

করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু তাকে ভালভাবে দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি। এ জন্য মিস ঝুমা তাকে দেখতে চায়......

হো হো করে হেসে উঠলো দলপতি, হাসি থামিয়ে বললো—সব ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না বা করা যায় না হেলালী। মিস ঝুমার ইচ্ছা পূরণ হবে না। তার দাবি যদি সীমার বাইরে হয় তাহলে তাকে খতম করে দেবে, দাবি পূরণের পূর্বেই...হাঁ, বনহুরের সাক্ষালাভ যদি তার একেবারেই কাম্য হয় তাহলে আর তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে হবে না।

স্যার!

হাঁ, আমার আদেশ পালনে এতটুকু ত্রুটি হলে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত শাস্তি কি তা নতুন করে স্মরণ করাতে হবে না। যাও বনহুরকে তার বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাও।

দলপতি আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলো।

যারা উপস্থিত ছিলো তারা বনহুরকে সঙ্গে করে নতুন এক কক্ষে এলো। বনহুরকে বললো একজন-বনহুর, তোমার এটা বিশ্রামকক্ষ।

কতক্ষণের জন্য এ কক্ষে আমাকে রাখা হবে? বললো বনহুর।

যতক্ষণ পুনরায় স্যারের নির্দেশ না পাওয়া যায়।

বেশ! তবে হাত দুখানা মুক্ত করে দেবে না তোমরা

সম্ভব নয়।

কেন?

স্যারের আদেশ তোমার হাত দুখানা মুক্ত করা যাবে না।

কথাগুলো বলে লোকটা তাকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিলো একটা চেয়ারে। তারপর ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে গেলো। দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর তাকালো নিজের হ্যান্ডকাপ পরা হাত দুটির দিকে।

*

মিস ঝুমা, এই নিন আপনার প্রাপ্য পুরস্কার! এ পুরস্কার আপনার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে! কথাটা বলে লোকটা হাসলো। তারপর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো!

সামনের টেবিলের ওপর রাখা নোটের গাদার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে মিস ঝুমা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললো—মিঃ চৌধুরী, দস্যু সম্রাট বনহুরকে সুকৌশলে গ্রেপ্তার করার মত আমার মাথায় যদি বুদ্ধি থাকে তবে আপনার দেয়া এ পুরস্কার আমার কাছে মোটেই চিরস্মরণীয় নয়। আমি চাই না আপনার এ পুরস্কার।

তবে কি চান আপনি?

আমি বনহুরকে স্বচক্ষে দেখতে চাই।

আপনি তাকে গ্রেপ্তার করায় সহায়তা করলেন অথচ তাকে স্বচক্ষে দেখেননি বলতে চান?

দেখেছি কিন্তু…আবছা অন্ধকারে তাকে আমি স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি।

মিস ঝুমা আপনার এ ইচ্ছাকে মুছে ফেলতে হবে।

না। আমি তার কাছে যাবো এবং তাকে আমি দেখবো।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বি, কে চৌধুরী

মিস ঝুমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। তারপর বললো—আপনি একটা জীবন্ত শয়তান!

আরাম কেদারায় সোজা হয়ে বসলো বি, কে চৌধুরী। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—মিস ঝুমা, আমি জীবন্ত শয়তান?

তা নয় তো কি? পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন।

সর্বনাশ করেছি আপনার?

শুধু আমার নয়, আমার মত বহু অসহায় নারীর।

মিস ঝুমা, আপনি অসহায়ঃ হাঃ হাঃ হাঃ যার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সীমাহীন। কোটিপতি যার কাছে হার মানে আর তিনি কি-না বলছেন আমি অসহায়। যাক ও সব কথা মিস ঝুমা, আপনার সঙ্গে বনহুরের কোনোদিনই দেখা হবে না কারণ, আজই আমরা তাকে তুলে দেবো সরকারের হাতে।

তার বিনিময়ে পাবেন কোটি কোটি টাকা!

হাঁ মিস ঝুমা, এবং সে কারণেই আপনার সামনে এই পুরস্কার যা আপনার জীবনের চরম পাওয়া। যাই বলুন, আপনি শুধু আমাদেরই পথ পরিস্কার করে দেননি। আপনি সমগ্র বিশ্বের জনগণকে এক অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলেন।

মিঃ চৌধুরী, আপনার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি দস্যু বনহুর নয়। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে তার মহত্বের কথাই শুনেছি। থেমে বললো ঝুমা-পূর্বে এতটা বুঝতে পারিনি তাই আমি এ কাজে আপনাকে সহায়তা করেছি বা করতে এগিয়ে এসেছি।

তাহলে আপনি—

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আমি ভুল করেছি।

এত সাহস আপনার, আমার মুখের ওপর আপনি আমাকে শয়তান বলতে পারলেন, তারপর আপনি আমাকে সহায়তা করে ভুল করেছেন বলছেন। জানেন এক্ষুণি আপনি কতবড় ভুল করলেন?

ভুল করেছি! হাঁ, আমি ভুল করেছি। আপনার মত অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে আমি আমার জীবনটাকে বিনষ্ট করেছি……

এই অট্টালিকা, এই ঐশ্বর্য, গাড়ি-বাড়ি সব কোথায় পেতেন মিস ঝুমা একদিন সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য আপনার বাবার জীবন শেষ হয়ে গেলো। বৃদ্ধা মায়ের হাত ধরে পথে বের হলেন বাসা ভাড়া দিতে না পেরে……

চুপ করুন মিঃ চৌধুরী। সেদিনের সুযোগ নিয়েই তো আপনারা আমার চরম সর্বনাশ করেছেন। এই অর্থ, এই ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ আমার জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ধন-সম্পদ অর্থ-ঐশ্বর্য আপনার জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাঁ, হাঁ, আমি এসবের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি আমার মনুষ্যত্ব আমার জীবন। আমার সবকিছু…আপনারা আমাকে ব্যবহার করেছেন আপনাদের ব্যবসায়।

অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয় মিস ঝুমা, আর সে কারণেই আজ আপনি এত ঐশ্বর্যের মালিক। এ শহরে আপনাকে চেনে না এমন ব্যক্তি নেই। একদিন যে ইসমৎ আরা বৃদ্ধা মায়ের হাত ধরে অফিসে অফিসে চাকরির সন্ধান করে ফিরেছিলো, সেই ইসমৎ আরা আজ ঝুমা। তার পায়ের তলায় এখন লক্ষ লক্ষ টাকা গড়াগড়ি যায়। কত নিঃসহায় মানুষকে চাকরি দান করে কৃতার্থ হয়…

এসব কেন শুনাচ্ছেন মিঃ চৌধুরী?

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কারণ আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেদিনের কথা। দশখানা একশ' টাকার জন্য আপনি…

খবরদার আর ওসব কথা মুখে আনবেন না। এক্ষুণি আমি পুলিশ ডেকে আপনার সব কথা ফাঁস করে দেবো। কত অসহায় তরুণীর আপনি সর্বনাশ করেছেন। কত তরুণকে আপনি ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদেশে পাঠানোর নাম করে অর্থ লুটেছেন। কত মানুষকে আপনারা সর্বহারা করেছেন নানা রকম কৌশলে।

এ সবের জন্য আপনিও কি দায়ী নন মিস ঝুমা?

দায়ী আমি? না, আমি দায়ী নই। আমাকে আপনারা বাধ্য করেছিলেন।

মিস মা, আমরা বিপদে পড়লে আপনিও বাদ যাবেন না, কারণ আমাদের দলের সঙ্গে আপনিও জড়িত আছেন। তাছাড়া আমি আপনাকে সে সুযোগ দিলে তো?

তার মানে?

মানে আমার কাছেই আছে! বি, কে চৌধুরী পকেটের উপরে হাত রেখে তার রিভলভারের অস্তিত্ব করে নিলেন।

ও, আপনি আমাকে হত্যা করতে চান কারণ আপনার স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেছে। আমার প্রয়োজন আপনার শেষ…

কথাটা তাই মিস ঝুমা। শুধু আমার প্রয়োজন শেষ হয়নি, আপনারও প্রয়োজন শেষ হয়েছে, কারণ এখন আপনি আর পাঁচ বছর পূর্বের সেই আপনি নেই। শুধু মাকে হারিয়েছেন কিন্তু আপনি পেয়েছেন অগণিত বন্ধুবান্ধব আর হিতাকাঙ্ক্ষী…।

বেরিয়ে যান। আপনাদের মত হিতাকাঙ্ক্ষীদের মুখে আমি থু দেই। আপনারা শুধু দেশের সর্বনাশ করেন না, সর্বনাশ করে চলেছেন সমগ্র বিশ্বের। অর্থের লোভ দেখিয়ে মানুষকে আপনার যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন। লুটে নিচ্ছেন অসৎ উপায়ে কোটি কোটি টাকা। আপনারা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি। আপনারা দেশের নেতা, দেশের রক্ষক সেজে ভক্ষক বনে বসে আছেন। না, না, আপনাদের আমি ছাড়বো না। পুলিশে ধরিয়ে দেব।

বি, কে চৌধুরী বুঝলেন মিস ঝুমা ক্ষেপেছে। এত দিন পর তার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে। অবশ্য এ ভয়টা বি, কে চৌধুরীর মধ্যে অনেক দিন থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছিলো। কারণ ইসম আরাকে মিস ঝুমা বানাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। অনেক প্রচেষ্টায় মিস ঝুমাকে হাতের মুঠোয় আনতে সক্ষম হয়েছিলো সে। একটা সামান্য কোনো চাকরির সন্ধানে ইসম, আরা যখন বৃদ্ধা মায়ের হাত ধরে তার অফিসে এসেছিলো তখন বি, কে চৌধুরীর চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। যখন জানতে পারলো ওরা বড় অসহায়, মা ও মেয়ে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে যে কোনো কাজ করতে রাজি আছে। তখন বি, কে চৌধুরী তাদের আর ফিরিয়ে দেয়নি। সেদিন হতেই ইসমৎ আরাকে অফিস সহকারিণী করলো বি, কে চৌধুরী এবং তাকে ঐদিন হতেই শিক্ষা দেয়া শুরু হয়েছিলো, কি তার কাজ।

প্রথম দিনই একটা মাথা গুঁজবার ঠাই পেয়ে খুব খুশি হলেও বি, কে চৌধুরীর কথাবার্তা এবং দৃষ্টিবাণ তাদের মনে সন্দেহের ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়েছিলো, তবুও কাজে যোগ দিয়েছিলো সেদিন ইসমৎ আরা। মাকে নিয়ে বি, কে চৌধুরীর আশ্রয়ই তার সেদিনের সম্বল ছিলো। তারপর শুরু হয় ইসমৎ আরার নুতন জীবন।

ক্ষুধার জ্বালা আর আশ্রয় ইসমৎ আরাকে মিস ঝুমায় পরিণত বি, কে তাকে ব্যবহার করলো তার ব্যবসার অস্ত্র হিসেবে।

মিস ঝুমার মা কিছুদিনের মধ্যেই পরপারে যাত্রী হলেন, রোগে শোকে-ব্যথা বেদনায় তিনি একদিন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন। সেকেলে মানুষ সহ্য করতে পারলেন না এই ঘৃণ্য জীবন। আদরিণী ইসমৎ আরা আর সেই ইসমৎ আরা রইলো না। সব সময় তাকে ব্যস্ত থাকতে হতো বি, কে চৌধুরীর আত্নতৃপ্তির জন্যে। কতকটা নাচের পুতুল হয়ে পড়লো ইসমৎ আরা। বৃদ্ধা মা সর্বক্ষণ একা নিঃসঙ্গ কাটাতে পারলো না, তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। যদিও তার এখন কোন অভাব-অভিযোগ ছিলোনা। তবুও শান্তি পেতেন না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা বৃদ্ধাকে পাগলিনী করে তুললো। এত সুখের চেয়ে তার সেই দুঃখময় জীবন অনেক শ্রেয় ছিলো।

একদিন বৃদ্ধা সকলের অজ্ঞাতে আত্নহত্যা করলো গলায় দড়ি বেঁধে।

সেদিন চৌধুরীর সঙ্গে কোনো এক পার্টিতেও গিয়েছিলো মিস ঝুমা। এখন সে ভাল গাইতে পারে, নাচতে পারে, অভিনয়েও সে দক্ষতা অর্জন করেছে। কাজেই ঝুমার মূল্য অনেক।

সেদিন ঝুমা পার্টি থেকে ফিরে এসে মায়ের খোঁজখবর নিতে পারেনি। রাতেও মায়ের কক্ষে যাবে কিনা ভাবছিলো হঠাৎ মন চাইলো মাকে একবার দেখতে। কিন্তু ঝুমা যখন মায়ের কক্ষে প্রবেশ করলো তখন যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তা বর্ণনাতীত। সে দেখলো তার জননী কক্ষের ছাদের সঙ্গে গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলছে।

মায়ের ঝুলন্ত প্রাণহীন দেহ আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ছিলো সেদিন ঝুমা। মায়ের প্রতি নিজের অবহেলার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলো সে দারুণভাবে। বি, কে চৌধুরী সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলো, একটা দুর্ভাবনা তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলো। মিস ঝুমা যদি বিগড়ে যায় তাহলে সব মাটি, কারণ ঝুমা তার ব্যবসার টোপ। যেমন বঁড়শির সঙ্গে টোপ গেঁথে মাছ ধরা হয় তেমনি বি, কে চৌধুরী ঝুমাকে ব্যবহার করতো বিজনেসের টোপ হিসেবে!

মায়ের মৃত্যুর পর ঝুমা ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলো। বারবার নিজের ওপর ধিক্কার এসেছিলো ঝুমার কিন্তু পারেনি সে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে। সুচতুর বি, কে

চৌধুরী মিস ঝুমাকে খুশি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলো। তাকে সরিয়ে নিয়েছিলো তার বাসস্থান থেকে কোনো এক নিভৃত বাংলোয়।

নানাভাবে ভুলিয়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিলো সে তাকে। জয়ী হয়েছিলো বি, কে চৌধুরী। কারণ মিস মা কয়েক দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হতে পেরেছিলো। বি, কে চৌধুরী জানতো কেমন করে তার মন থেকে মায়ের কথা বিস্মৃত করা যাবে।

যত স্বাভাবিকই হোক না কেন ঝুমা, মায়ের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গেলো না। প্রায়ই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তো। ভাবতে অতীত জীবনের কথা। পিতা ছিলো তার সামান্য চাকরিজীবী। অল্প পয়সায় সংসার চালাতে হতো। এটা আনতে ওটা ফুরিয়ে যেতো। ছোটবেলা থেকেই ঝুমা অভাবে মানুষ। কঠিন অসুখে বাবা মারা গেলো, কোনো ওষুধ জুটলো না তার ভাগ্যে। এমনকি পথ্যাপথ্যও পেলো না সে মৃত্যুর পূর্বে।

পিতার মৃত্যুর পর দেনাদারগণ এসে ধরলো ঝুমার মাকে, বাড়ি থেকে বের করে দিলো বিনা দ্বিধায়।

ঝুমা তার মাকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলো। ঝিয়ের মত কাজ করেও সেখানে নানা কথা শুনতে হতো, তবুও চোখ কান বন্ধ করে রয়ে গেলো ঝুমা তার মাকে নিয়ে। অসহায় অবস্থা, কোনো আশ্রয় নেই তাদের, যাবেই বা কোথায়?

নানা রকম লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে কাটিয়ে দিলো বছর কয়েক। কুমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্নীয়া মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, ঝুমা ও তার মায়ের ওপর। কারণ এত বড় সেয়ানা মেয়ে নিয়ে তাদের বাড়িতে থাকা চলবে না। মানুষে মন্দ বলবে, তাছাড়া কখন কোন কলঙ্ক বাধিয়ে বসবে কে জানে!

একদিন ঝুমা আর তার মা পরম আত্নীয়ের বাড়ি থেকে পথে বেরিয়ে পড়লো। কিছু লেখাপড়া জানে ঝুমা তাই ছোটখাটো কোনো চাকরি পেলেও মা-মেয়ের চলে যাবে। অনেক জায়গায় ঘুরলো তারা। কিন্তু কোথাও একটু স্থান জুটলো না।

ঝুমার মন বিষিয়ে উঠলো, হায়রে এইতো সমাজ! কেউ তাদের এ করুণ অবস্থা দেখেও তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখালো না, এতটুকু আশ্রয় তারা পেলো না

কোথাও। যেখানেই গেছে সেখানেই ঝুমা আর তার মা পেয়েছে তিরস্কার। কারণ বয়স্ক মেয়ে নিয়ে কেউ তাদের আশ্রয় দিতে রাজি নয়।

কিন্তু সে কি এর জন্য দায়ী? ঝুমার রূপ-যৌবন সে তো আল্লার দান। যদিও বা কেউ আশ্রয় দিতে চেয়েছে, তারা তার বিনিময়ে পেতে চেয়েছে তার দেহ, তার ইজ্জত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বেছে নিতে হয়েছিলো পাপময় জীবন। একমুঠি অন্নের জন্য, একটু আশ্রয়ের আশায়। এর জন্য দায়ী কে? সমাজ না সে নিজে…ভাবে ঝুমা।

বি, কে চৌধুরী সিগারেট পান করছিলো এবং লক্ষ করছিলো ঝুমার মুখমন্ডল। একদিন হয়তো ঝুমা তার এই জীবনের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে জানতো বি, কে চৌধুরী, আর সে জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বি, কে চৌধুরী লক্ষ করছিলো ঝুমার মুখমন্ডল, হঠাৎ আজ সে এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাতে বেশ ভড়কে গেল বি, কে চৌধুরী কিন্তু সে মুখভাব রেখে বললো–মিস ঝুমা, আপনি আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেই আমি বেরিয়ে যাবো! না, কিছুতেই না, কারণ এ বাড়ি আমার।

তীব্রকণ্ঠে বললো ঝুমা–আপনার?

হা। শুধু এ বাড়িই নয়, এ বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র সবই তো আমার।

মিথ্যা কথা!

না।

নর শয়তান আপনি

এর বেশি কিছু বলতে যাবেন না মিস ঝুমা কারণ আপনি আজ কার দয়ায় বেঁচে আছেন?

এ বাচার চেয়ে মৃত্যু আমার অনেক শ্রেয় ছিলো। তোমার মত জল্লাদের হাতে পড়ে আমি রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে গেছি।

সত্যি এটা তোমার মনের কথা মিস ঝুমা।

হ্যাঁ, এতদিন তুমি যা বলেছে তা করেছি কিন্তু…

ও, তোমার দিব্যদৃষ্টি তাহলে খুলে গেছে, কি বলো? তোমার দ্বারা তাহলে আমার আর কোনো আশা নেই।

না! না! আমি তোমার সব কথা ফাঁস করে দেবো।

কিন্তু সে সুযোগ তুমি পাবে না।…বি, কে চৌধুরী হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে প্রজে রেখে মিস কুমার দিকে এগিয়ে এলো দুহাত প্রসারিত করে।

ঝুমা কঠিন কণ্ঠে বললো—তুমি আমার দ্বারা অনেক পাপ করিয়েছে, আর নয়…..

আমিও তোমার দ্বারা আর কোনো কাজ পাবো না জানতে পারলাম তাই বি, কে চৌধুরী গলা টিপে ধরলো দুহাতে ঝুমার।

ঝুমা ভাবতেও পারেনি বি, কে চৌধুরী তাকে এই মুহূর্তে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হবে। বি, কে চৌধুরী যখন ঝুমার গলা দুহাতে ভীষণ জোরে টিপে ধরলো তখন তার জিভটা বেরিয়ে এলো মুখের ভিতর হতে, চোখ দুটো গোলাকার হয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। একটা গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগলো ঝুমার গলার মধ্যে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে কুমার দেহটা অসাড় হয়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে বি, কে চৌধুরী নিজের পাজরে ঠান্ডা কোনো শক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুমার গলায় হাত দুখানা তার শিথিল হয়ে এলো। ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে আরষ্ট হলো বি, কে চৌধুরী, জমকালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি তার পাজরে রিভলভার চেপে ধরেছে।

বি, কে চৌধুরী কিছু বলবার পূর্বেই বললো জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি- ওকে হত্যা করে তুমি নিজের পাপকর্মগুলো চাপা দিতে চেয়েছিলে!

জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বি, কে চৌধুরী অবাক হয়ে গেছে-কে এই অদ্ভুত পোশাক পরিহিতা নারী!

ঝুমা বি, কে চৌধুরীর, হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে নতুন জীবন লাভ করলো। সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু'চোখেও বিস্ময় ঝরে পড়ছে। হঠাৎ এমনভাবে উদ্ধার পাবে ভাবতেও পারেনি ঝুমা। সে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। গলাটা ব্যথায় টন টন করছে সে কথাও যেন ভুলে গেছে ঝুমা।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি তার রিভলভার তখনও বি, কে চৌধুরীর পাজরে পূর্বের মতই চেপে ধরে আছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তিকে তুমি তোমার ব্যবসার চরম শিকার ধরবার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে আজ তাকেই তুমি হত্যা করতে যাচ্ছিলো তোমাদের সাধুতার মুখোস উন্মোচন হয়ে গেলো। এতদিন সমাজের নেতৃস্থানীয় পদে সমাসীন থেকে অসহায় জনগণের সর্বনাশ করে যাচ্ছিলে কিন্তু আর তা হতে দেয়া হবে না।

বি, কে চৌধুরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। কে এই নারী, শুধু আশ্চর্যজনকই নয় তার কার্যকলাপ, একেবারে বিস্ময়কর। আচম্বিতে কোথা হতে এলো সে এই মুহূর্তে?

সুচতুর বি, কে চৌধুরী পা হতে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো—তোমার পরিচয় পেলে ধন্য হতাম। বলবে কি, কে তুমি?

খিল খিল করে হেসে উঠলো জমকালো পোশাক পরিহিতা, বললো—শুনেছি তুমি বড় চালাক এবং শিয়ালের মতো ধূর্ত। শুধু তুমি নও, তোমার মতো যারা দেশের নেতৃস্থানীয় আসনে আছে তারা সবাই দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের সর্বনাশ করছে সবার অলক্ষ্যে। বনহুর তোমাদের পেছনে লেগেছিলো বলে তোমরা তাকে সুকৌশলে বন্দী করেছো

এত কথা তুমি জানলে কি করে? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বি, কে চৌধুরী।

আবার সেই বিস্ময়কর হাসি।

ঝুমা আশ্চর্য কম হয়নি, সে কি স্বপ্ন দেখছে না সত্য। জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি তার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। যে মুহূর্তে বি, কে চৌধুরী তাকে দুনিয়া থেকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করছিলো ঠিক সেই সময়

আবির্ভাব ঘটেছে এই অদ্ভুত পোশাক পরিহিতা নারীটির। যদিও তার মুখমন্ডল সম্পূর্ণ আবরণে ঢাকা তবুও বেশ বোঝা যাচ্ছে সে নারী। এ ছাড়া কণ্ঠস্বরও নারীকণ্ঠ।

বি, কে চৌধুরী পা থেকে ওর মাথা পর্যন্ত লক্ষ করছিলো। শরীরে জমকালো পোশাক, পরনের প্যান্ট এবং সাট কক্ষের আলোতে চকচক করছে। মাথায় ক্যাপ। চোখে অদ্ভুত ধরনের কালো চশমা। নাকের ওপর হতে নিচের অংশ কালো রুমাল বাধা। পায়ে হাঁটু অবধি ভারী বুট। কোমরের বেল্টে রিভলভারের খাপ এবং সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

নারীমূর্তি বললো—কি দেখছো অমন করে?

বি, কে চৌধুরী বললো—দেখছি, তুমি কেমন করে ঠিক এমন মুহূর্তে এলে যার জন্য আমি আমার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলাম…কে তুমি?

আমার পরিচয় জেনে তোমার কোন লাভ হবে না। কারণ আমি তোমাদের কারো পরিচিত নই।

তুমি কি তাহলে মিস ঝুমাকে রক্ষার জন্যে এসেছে। বি, কে চৌধুরীর পাঁজরে তখনও রিভলভার থাকা সত্ত্বেও সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বলে মনে হলো। কারণ এ মুহূর্তে সে ভুলে গেলো যে, সে নিজে একজন অপরাধী।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি বললো—তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নই আমি। তারপর ঝুমার দিকে তাকিয়ে বললো—বোন, এখন তুমি নিশ্চিন্ত কারণ বি, কে চৌধুরী আর তোমার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

এবার ঝুমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তিটাকে তার বড় আপনজন বলে মনে হলো। সত্যি সে যদি ঐ সময় এসে না পড়তে তাহলে এতক্ষণ ঝুমার প্রাণহীণ দেহ সোফাটার ওপরে কাৎ হয়ে ঢলে পড়ে থাকতো। মিস ঝুমার চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছিলো, চোখের সামনে সে দেখতে পেয়েছিলো অসংখ্য তারকারাজির মত ফুলঝুরি আর জমাট অন্ধকার।

বি, কে চৌধুরীর পাজরে রিভলভার চেপে ধরে তাকে নিয়ে গাড়িতে বসলো জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি। গাড়িতে বসবার পূর্বে তার সঙ্গে কোনো

অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিলো সে রিভলভার ঠিক রেখে।

মিস ঝুমা দেখলো এ গাড়ি সম্পূর্ণ নতুন। ড্রাইভার বা কোনো লোকন নেই গাড়িখানার পাশে।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি গাড়ির ড্রাইভ আসনে বসে রিভলভার ঠিক রাখলো বি, কে চৌধুরীর পাঁজর লক্ষ্য করে এবং এক হাতে সে ড্রাইভ করে চললো, পাশে বসিয়ে নিলো বি, কে চৌধুরীকে। রিভলভারখানা কারও নজরে না পড়ে সেদিকে ভালোভাবে লক্ষ রাখলো নারীমূর্তি।

নির্জন পথ ধরে গাড়িখানা এগুচ্ছিলো।

এবার নারীমূর্তি গাড়িখানা থামিয়ে ড্রাইভ আসনে বি, কে চৌধুরীকে বসার জন্য নির্দেশ দিলো।

বি, কে চৌধুরী বাধ্য দাসের মত ড্রাইভ আসনে বসলো। নারী মূর্তি পাশে বসে হাতের রিভলভার ঠিক রাখলো। বললো সে–বি, কে চৌধুরী–তুমি বনহুরকে কোথায় আটক করে রেখেছে সেখানে চলো।

বনহুর!

হাঁ

আমি জানি না সে কোথায়।

মিথ্যা কথা। আমি সব অবগত আছি। বনহুরকে আটক করে তুমি নিজের পথ পরিস্কার করে নিতে চাও কিন্তু তা হবে না। হয় তুমি আমাকে সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে নয় মৃত্যুবরণ করবে–এর মধ্যে কোনটা তোমার কাম্য?

নির্জন পথ।

চারদিকে ঝি ঝির অশান্ত আওয়াজ। ড্রাইভ আসনে বি, কে চৌধুরী আর তার পাশে জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি। অদ্ভুত মুখোশের নিচে কেমন একটা মুখ আছে কে জানে।

নারীমূর্তি যেই হোকনা কেন সে যে ভীষণ চালাক এবং সুচতুর তাতে কোনো ভুল নেই। ধূর্ত বি, কে চৌধুরীর মত ব্যক্তি তার কাছে ভিজা বিড়ালের মত কাবু হয়ে পড়েছে।

এমন অমূল্য জীবন বিনষ্ট হোক এটা চায় না বি, কে চৌধুরী। ভয় তার জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তিকে নয়, তার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটিকে। হঠাৎ যদি কোনোক্রমে একটা গুলি ফসকে যায় তাহলে আর রক্ষা নেই। এত সাধের জীবনটা অকালে ঝরে পড়বে…

বলে জমকালো পোশাক পরিহিতা কি ভাবছে বি, কে চৌধুরী?

বি, কে চৌধুরী অত্যন্ত চালাক, সে জমকালো পোশাক পরিহিতার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো–আমি জানি তুমি কি চাও। বেশ, বনহুরের ব্যাপারে যে অর্থ আসবে তার অর্ধেক আমি দিয়ে দেবো তোমাকে। এবার তুমি আমার সঙ্গে হাত মিলাতে রাজি?

খিলখিল করে হেসে উঠলো জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি। সে হাসির শব্দ নির্জন পথকে মুখর করে তুললো। সৃষ্টি করলো একটা বিস্ময়কর পরিবেশ। বি, কে চৌধুরী এতকাল নানা ধরনের চাতুরির খেলা খেলেছে কিন্তু এমন অবস্থায় পড়েনি সে। আজ নতুন এক অবস্থা তাকে হতভম্ব করে ফেলেছে।

হাসি থামিয়ে বললো নারীমূর্তি—তোমার সঙ্গে শেয়ারে থাকতে রাজি নই, কাজেই তোমার সঙ্গে হাত মিলানোর কোনো প্রশ্ন আসছে না।

তাহলে?

তোমার প্রাণের বিনিময়ে আমি বনহুরকে চাই।

ও তুমি একাই তাহলে……

হ্যাঁ, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছো তাহলে বি, কে চৌধুরী আর বিলম্ব করো না, চলো। তাছাড়া জেনে রাখো তোমার কোনো চাতুরি কাজে আসবে না, কারণ তোমার সাহায্যকারিগণ কেউ আর জীবিত নেই।

দুচোখ কপালে উঠলো বি, কে চৌধুরীর, সে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আমার লোকজন কেউ জীবিত নেই?

না! চলো সব জানতে পারবে।

বি, কে চৌধুরীর মুখমন্ডলে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। নারীমূর্তির কথা কি সত্য না মিথ্যা। সে বিলম্ব না করে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

পথের দুপাশে লাইটপোষ্টগুলো নীরবে আলো বিতরণ করছে। কেউ পথে নেই, এমন কি এ পথে কোনো যানবাহনও চলছে না।

গাড়ি গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছে গেলো এক সময়।

জমকালো মূর্তি নামবার পূর্বেই বি, কে চৌধুরী ড্রাইভ আসন থেকে নেমে পড়লো এবং প্রবেশ করলো তার অদ্ভুত ধরনের ফটকের মধ্যে। জমকালো মূর্তি এক মুহূর্তের জন্যও সরে যায়নি। সে রিভলভার ঠিক রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করলে একটুও বোঝার উপায় নেই, এখানে কোনো পথ আছে। সেই অদ্ভুত পথ দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েই বি, কে চৌধুরী হঠাৎ করতালি দিলো।

আবার হেসে উঠলো বিস্ময়কর নারীমূর্তি, বললো–একটি ব্যক্তিও সজ্ঞানে নেই বি, কে চৌধুরী, কারণ তারা সবাই এখন পরপারের যাত্রী। চলো কোথায় বনহুরকে রেখেছে সেই গুপ্তস্থানে। একটু চালাকি করতে গেলে তোমার সহকারীদের পথ অনুসরণ করতে তুমিও বাধ্য হবে।

বি, কে চৌধুরীর মুখমন্ডল মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হলো। সে বুঝতে পারলো তার করতালি শ্রবণ করেও একটি প্রাণী এগিয়ে এলো না। সবাই যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। কর্পূরের মত উবে গেছে, সব ব্যাপারখানা অত্যন্ত জটিল লাগছে তার কাছে।

নারীমূর্তি বললো—কেন বিলম্ব করছে, কেউ আসবে না তোমার যমদূত ছাড়া। যদি এ মুহূর্তে বাঁচতে চাও তবে একদন্ড আর দেরী করো না। চলো, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বি, কে চৌধুরী তার নিজের গোপন আস্তানায় নিজেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। একটি কথাও সে বলতে পারলো না। কারণ নারীমূর্তিটি তাকে কৌশলে বন্দী করেছে। একচুল এদিক ওদিক হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

বাধ্য হলো সে নারীমর্তির কথা শুনতে।

নিজের জীবনের চেয়ে পৃথিবীর কোন বস্তু কামনার থাকতে পারে মানুষের কাছে! বি, কে চৌধুরীর কাছেও তার জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

বি, কে চৌধুরী অনেক কিছু ভাবছে, এমনভাবে তার সহকারিগণ উধাও হবে এটা বিস্ময়কর বটে। নারীমূর্তিটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বি, কে চৌধুরী কৃতদাসের মত।

কিছুটা অগ্রসর হবার পর একটি সুড়ঙ্গপথ সামনে দেখা গেলো।

সুড়ঙ্গে প্রবেশ করবার পূর্বে বললো নারীমূর্তি–একটুও চাতুরি চলবে না বি, কে চৌধুরী। মৃত্যু তোমার শিয়রে, কাজেই শান্তভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বি, কে চৌধুরী শিয়ালের মত ধূর্ত হলেও তার এখন ফাঁদে পড়া ভিজা বিড়ালের মত অবস্থা, তাই সে নীরবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

*

লৌহকপাট খোলার শব্দ পেয়ে বনহুর চোখ তুলে তাকালো। বন্দী অবস্থায় তার মনে কোনো দুশ্চিন্তা ছিলো না, কারণ সে কতকটা স্বেচ্ছায় এই বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে। বনহুর ইচ্ছা করলে এদেরকে কাবু করে সরে পড়তে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। গভীর এক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলো বনহুর নিজের অজান্তে। জানতে চেয়ে ছিলো এরা কারা এবং কি তাদের উদ্দেশ্য।

অবশ্য বনহুরের জানা হয়ে গেছে ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য কি এবং কেন তারা সুকৌশলে তাকে আটক করেছে। যতই সহজ লাগুক এখন অত্যন্ত ঘোলাটে লাগছে ব্যাপারটা তার কাছে। কারণ তাকে বন্দী করে আনার পর তিনদিন তিনরাত অতিবাহিত হয়েছে, এর মধ্যে প্রথম দুদিন তার কক্ষে খাবার পৌঁছে দেয়ো হয়েছে কিন্তু তারপর আর কেউ আসেনি তার বন্দীশালার আশেপাশে।

কাউকে নজরেও পড়েনি, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে অথচ কারও দেখাসাক্ষাৎ নেই। সব যেন হাওয়ায় উধাও হয়েছে।

তবে বনহুর যে বন্দীশালায় আছে, তা একেবারে ভূগর্ভে দুর্গম স্থানে অবস্থিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ স্থান খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।

বনহুর ফিরে তাকাতেই অবাক হলো কারণ মিঃ বি, কে চৌধুরীই এই ষড়যন্ত্রকারীদের দলপতি এবং তার কুবুদ্ধি বলেই পরিচালিত হচ্ছে এসব। তাকে দেখে অবাক হলো, একারণে তার সঙ্গে জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি কে?

অবাক দৃষ্টি নিয়ে বনহুর তাকালো এবং শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

বি, কে চৌধুরী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো–এই সেই বনহুর! এবার আমার পাঁজর থেকে তোমার হাতখানাকে সরিয়ে নাও এবং বলো কোথায় আমার সহকারিগণ।

জমকালো পোশাক পরিহিতা তার মুখোশের মধ্যে চোখ দুটো বনহুরের দিকে নিক্ষেপ করলো। তারপর বললো—বি, কে চৌধুরী, তোমাকে মুক্তি দিলাম কিন্তু তুমি আমাদের বাইরে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারবে না।

আমার সহকারিগণ।

তাদের ফিরে পাবে কিন্তু তারা সবাই অন্ধ এবং বধির হয়ে গেছে। কেউ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।

কি বলছো তুমি!

হাঁ, আমার লোক তাদের এ অবস্থা করেছে। কারণ তারা যদি পূর্বের ন্যায় দেখতে পেতো এবং শুনতে পারতো তাহলে তারা এ মুহূর্তে তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। যতক্ষণ আমরা তোমার এই রহস্যময় গুপ্ত আস্তানা থেকে বাইরে না যাবো ততক্ষণ তুমি এই কারাকক্ষে বন্দী থাকবে।

দুচোখ কপালে উঠলো বি, কে চৌধুরীর। বললো সেনা না তা হয় না, আমিও এই বন্দীশালা হতে বেরিয়ে যেতে চাই।......

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই বনহুর জমকালো পোশাক পরিহিতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো দ্রুতগতিতে, তারপর বাইরে হতে দরজা বন্ধ করে দিলো।

চিৎকার করে উঠলো বি, কে চৌধুরী, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনা গেলো।

বনহুর তাকালো জমকালো পোশাক পরিহিতার দিকে। দুচোখে তার বিস্ময়, কে এই নারী! বনহুর তার কণ্ঠস্বর চিনতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পেরেছে যে সে নারী। কিন্তু কে সে? যে তাকে এই বন্দীশালা থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে। কিইবা তার উদ্দেশ্য।

বললো জমকালো পোশাক পরিহিতা নারী–এখন কিছু ভাববার সময় নেই। এসো আমরা এই নরকপুরী হতে বেরিয়ে যাই।

বনহুর কোনো কথা বললো না।

জমকালো পোশাক পরিহিতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বনহুর সেই দুর্গম গুপ্ত বন্দীশালা হতে।

বাইরে আসার পর হঠাৎ ফিরে তাকালো বনহুর কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। জমকালো পোশাক পরিহিতা কোথায় চলে গেলো। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে সে।

বনহুর অবাক হয়ে ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে শোনা গেলো অশ্বখুরের শব্দ।

*

আবার এলে? অবাক কণ্ঠে বললো নূরী।

বনহুর তার পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে বললো—দাইমার কথা রক্ষা করেছি। আমার মায়ের কোলে আমি ফিরে গিয়েছিলাম কিন্তু…

কিন্তু কি বলো?

পারলাম না স্বভাব পাল্টাতে।

আবার তাই দস্যুতা…

না, দস্যুতা নয়, স্বাভাবিক জীবন বেছে নেবো ভেবেছিলাম কিন্তু ভাগ্য আমাকে তা হতে দিলো না।

কারণ?

মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিশেষ কোনো জরুরি কাজে কিন্তু ফিরে আসতে পারলাম না। সুকৌশলে আমাকে কোনো ষড়যন্ত্রকারীদল বন্দী করলো–

তুমি! তুমি বন্দী ছিলে এ ক'দিন?

হাঁ।

তারপর?

কতকটা ইচ্ছা করেই বন্দী ছিলাম নূরী।

জানি, নইলে তোমাকে বন্দী করে রাখে এমন লোক বিশ্বে আছে? আজও তুমি তেমনি আছো যেমনটি বিশ বছর পূর্বে ছিলে। তোমার বলিষ্ঠ সবল পৌরষদীপ্ত দেহ, তোমার গভীর নীল দুটি চোখ, তোমার প্রশস্ত বক্ষ, তোমার......

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

নূরী অবাক কণ্ঠে বলে–হাসছো যে বড়?

সত্যি তোমার কথা শুনে না হেসে পারলাম না।

আমি মিথ্যা কোনোটা বলেছি? আজও তোমার মধ্যে পূর্বের সবকিছু বজায় আছে। পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা, সেই সুন্দর বিস্ময়কর হাসি......

নূরী, তুমি বড় ছেলেমানুষি কথা বলছো?

তুমি অস্বীকার করতে পারো, এখনও কোন্ তরুণী তোমাকে কামনা না করে। তোমার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কার মন না কেড়ে নেয়। তোমার গভীর নীল দুটি চোখ আজও সবার মনে রেখা টানে.......

ব্যস অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি নতুন করে আজ আবার সেই পুরোন বুলি আওড়াবে এ আমি ভাবতে পারিনি নূরী। শোন, মনিরার কাছে বলে গিয়েছিলাম, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি একটু পরই ফিরে আসবো কিন্তু গভীর এক ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে কয়েকটা দিন কেটে গেলো। সব শুনে তুমি অবাক হবে।

তুমি তো কোনোদিন আমাকে এমন করে তোমার জীবনের কোনো ঘটনা বলল না। আজ এমন কি ঘটেছে যা তোমার সাগরতলের নেই বিস্ময়কর ঘটনার চেয়েও আশ্চর্যকর?

ঠিক ততখানি না হলেও বিস্ময়কর বটে......বনহুর শহরের বাড়ি হতে বাইরে বের হবার পর যা যা ঘটেছিলো সংক্ষেপে সব বললো বনহুর, শেষে জমকালো পোশাকপরা সেই নারীমূর্তির কথাও বললো সে—জানি না কে সেই নারীমূর্তি যে আমাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলো দুর্গম কারাগারে? তারপর কোথায় সে উবে গেলো তাও ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না...

নূরী এতক্ষণ দুচোখে বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো বনহুরের কথাগুলো, সত্যি সে কোনো দিন এমন করে কোনো কিছু ব্যক্ত করেনি আজ যেমন করে সমস্ত কথাগুলো গুছিয়ে বললো। নূরী কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললো–হয়তো বা আশা!

বনহুর মাথা নেড়ে বললো—না, সে নয়, আমি তার কণ্ঠস্বর চিনি।

তবে কি রাণী দুর্গেশ্বরী?

সেও নয়।

তবে কে সে?

এ প্রশ্ন আমার মনকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে। এমন কোনো মহিলা হতে পারে যার বুদ্ধিবলের কাছে সুকৌশলী বি, কে চৌধুরীর মত ধূর্ত ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

নূরী মৌনভাবে কিছু সময় চিন্তা করে বললো–হুঁর, তুমি এক বিস্ময়, তার চেয়ে বিস্ময়কর সেই নারী যে তোমাকে এমন এক অবস্থা হতে বিনা দ্বিধায় মুক্ত করে আনলো। সত্যি তাকে আমি প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যাক, ওসব কথা ভেবে এখন আর কোনো ফল হবে না। তোমার জামাকাপড়গুলোর কি অবস্থা হয়েছে।

নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো বনহুরআজ কয়েকদিন হলো এই বস্ত্র পরিধান করে রাতদিন অতিবাহিত হয়েছে, কাজেই বুঝতে পারছে–চলো নূরী স্নানাগারে যাই।

বনহুর আর নূরী দুজন মিলে আস্তানার স্নানাগারে প্রবেশ করলো, তারপর ঝর্ণার পানিতে নেমে পড়লো বনহুর।

নূরী দাঁড়িয়ে ছিলো উপরে।

বনহুর বললো কতদিন দুজন একসঙ্গে সাঁতার কাটিনি, এসো নূরী।

না, কেউ দেখে ফেলবে।

দেখলেই বা, তাতে ক্ষতি কি বলে?

জাভেদ এখন আস্তানায়...তুমি আর আমি সাঁতার কাটবো, জাভেদ যদি এসে পড়ে!

স্নানাগারের দরজা বন্ধ করে দাও।

নূরী বললো–তুমি একাই গোসল সেরে নাও। আমি বরং এখানে দাঁড়িয়ে তোমার গোসল করাটা উপভোগ করি।

বড় আশ্চর্য ছিলো বনহুরের এই স্নানাগার। ভূগর্ভে এত সুন্দর নিপুণভাবে তৈমুর স্নানাগার বিশ্বের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কান্দাই পর্বতমালা হতে যে ঝর্ণাধারা কান্দাই জঙ্গলের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে তারই একটি শাখা কৌশলে ভূগর্ভ স্নানাগারে নেয়া হয়েছে। তাই বড় অদ্ভুত আর সুন্দর ছিলো এই স্নানাগার।

এ স্নানাগার তৈরি করেছিলো দস্যু কালুখ। গরিবের সন্তান হয়েও কালুখার চিন্তাধারা ছিলো আলাদা। সমাজের নিষ্ঠুরতার চরম আঘাতে জর্জরিত কালু খাঁ যখন দস্যুতার সিদ্ধহস্ত হলো তখন তার পায়ের তলায় কোটি কোটি টাকা, ধনরত্ন

গড়াগড়ি যেতে লাগলো। যেমন খুশি তেমনভাবে গড়ে তুললো কালু খাঁ তার ভূগর্ভ আস্তানা। বিস্ময়কর ভাবেই তৈরি করা হলো সবকিছু। কান্দাই জঙ্গলে সম্পূর্ণ পোড়াবাড়ী বলেই মনে হতো বাড়িখানা দেখলে। কিন্তু তার অভ্যন্তরে রয়েছে বিরাট সিংহমুখ। বৃহৎ আকার সিংহমুখ গহ্বরেই ছিলো ভূগর্ভ আস্তানায় প্রবেশের সুড়ঙ্গমুখ। সিংহমুখ পেরিয়ে একটি ব্যাঘ্র মুখ, তার হা-করা মুখের মধ্যে একটি দাঁতে চাপ দিলে বেরিয়ে আসতো সুন্দর একটি পরিচ্ছন্ন পথ, সেই পথে কালু খাঁ নেমে যেতে তার ভূগর্ভ আস্তানায়। তেমনি ছিলো দরবারকক্ষ। ভূগর্ভে এত সুন্দর দরবারকক্ষ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কালু খাঁ কান্দাই জঙ্গলের তলদেশে এত নিপুণভাবে একটি আস্তানা গড়ে তুলেছিলো যা পৃথিবীর যে কোনো মানুষের অবিশ্বাস্য বটে।

বনহুর প্রাণভরে সাঁতার কেটে গোসল করলো, ঝর্ণা থেকে উঠবার সময় হাত বাড়ালো নূরীর দিকে। নূরীও হাত বাড়িয়ে দিলো।

নূরীর হাত ধরে উঠে এলো বনহুর ঝরণার পানি থেকে।

নূরী নিজের আঁচলে বনহুরের শরীরের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বললো–হুর, তুমি আসবে আমি জানতাম।

সত্যি বলছো নূরী?

হাঁ, আমি স্বপ্নে দেখেছি তুমি এসেছো।

এখনও তুমি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছো?

হুর, শুধু আমি কেন, পৃথিবীর বহু নারীই তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। নইলে অজানা কোনো এক নারী জমকালো পোশাকে নিজেকে গোপন রেখে তোমাকে উদ্ধার করতে যেতে না। নিশ্চয়ই তুমি তার স্বপ্নের মানুষ।

এ সব কি বলছো নূরী?

সত্যি তাই……।

যা খুশি বলল আমি কিন্তু সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে নির্দোষ, কারণ…

থাক কারণ জানতে চাই না। চলো কত সময় হলো তুমি খাওনা কে জানে। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ক্ষুধার্ত।

সে কথা মিথ্যা নয় নূরী। চলো খাবার দেবো।

বনহুর আর নূরী স্নানাগার হতে বেরিয়ে এলো, এগিয়ে চললো বিশ্রামাগারের দিকে।

*

ব্যস্ততার সঙ্গে বিশ্রামাগারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো রহমান। চোখেমুখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ। হাতে তার একটি নীল চিঠি। দরজায় দাঁড়িয়ে বললো–সর্দার, আসতে পারি?

কে রহমান?

হাঁ, সংবাদ আছে সর্দার!

এসো, ভেতরে এসো।

নুরী পাশে বসে ছিলো, সে উঠে দাঁড়ালোলা এবং বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকালো দরজার দিকে।

রহমান প্রবেশ করলো! কুর্ণিশ জানিয়ে সে হাতের চিঠিখানা এগিয়ে ধরলো সর্দারের দিকে। মুখে সে কিছু বললো না।

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো, চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো সোজা হয়ে, তারপর বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কাগজে চোখ রেখেই বললো—এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে রহমান।

রহমান বললো—সর্দার, কান্দাই জঙ্গলের ধারে একটি বৃক্ষের সঙ্গে একটি লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলো, তার বুকের সঙ্গে আটকানো ছিলো এই চিঠিখানা।

লাশের সঙ্গে?

হাঁ সর্দার।

বিস্ময়কর বটে!

সর্দার, চিঠির ভাষা আমরা বুঝতে পারিনি, ওটা কোন ভাষা তাও বুঝা সম্ভব হলো না, তাই ছুটে এলাম আপনার কাছে।

এটা গুজরাটি ভাষা।

সর্দার আপনি,

হাঁ, আমি সামান্য কিছু কিছু জানি।

ওটাতে কি লেখা আছে।

এই চিঠি আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র। এটাতে লেখা আছে, বনহুর তুমি যেখানেই থাকো বেরিয়ে এসো, নইলে প্রতিদিন তোমার জীবনের বিনিময়ে একটি করে নিরীহ মানুষের জীবন আমরা বিনাশ করবো।

—নীলাঞ্জনা

রহমান এবং নূরীর চোখেমুখে ফুটে উঠলো ভীষণ একটা বিস্ময়কর ভাব। এ ওর মুখের দিকে তাকালো তারা বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে এ মুহূর্তে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—নিশ্চয়ই এটা সেই কুচক্রী বি, কে চৌধুরীর কাজ। তাকে তারই বন্দীশালায় বন্দী করে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। হয়তো বা সেই বন্দীশালার কোনো স্থানে গোপন কোনো দরজা ছিলো যে পথে সে বেরিয়ে এসেছে। সে আমাকে কৌশলে বন্দী করেছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে পারেনি, তাই সে নতুন একটা কৌশল অবলম্বন করেছে।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—একটি জীবনের বিনিময়ে প্রতিদিন ওরা হত্যা করবে একটি করে নিরীহ মানুষ?

রহমান বললো—তারা জানে বনহুর কোনো নিরীহ ব্যক্তির ক্ষতি সাধন কামনা করে না। এ কারণেই এই নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে তারা।

কি উদ্দেশ্য এদের? বললো নূরী।

বনহুর হেসে বললোবনহুরকে তারা বন্দী করে হত্যা করতে চায় এবং উদ্দেশ্য তাদের চলার পথ কণ্টকমুক্ত হোক। একটু থেমে আপন মনে বললো বনহুর—বি, কে চৌধুরীর মতলব দেশ ও দশের সর্বনাশ সাধন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি।

সর্দার, লাশটা আমরা আস্তানায় নিয়ে এসেছি।

চলো একবার দেখি। বনহুর চিঠিখানা হাতের মধ্যে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর এগিয়ে চললো রহমানের সঙ্গে। দরবারকক্ষের সামনে মৃতদেহটি রাখা হয়েছে।

বনহুর লাশটি পরীক্ষা করে ব্যথিত হলো। ঠিক চিনতে না পারলেও বেশ বুঝতে পারলো যাকে ওরা হত্যা করেছে সে একজন শ্রমিক ছাড়া কেউ নয়। তার পরিধেয় বস্ত্র মলিন, জীর্ণ দেহ, রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখমন্ডল, কোটরাগত চোখ। লোকটিকে হত্যা করা হয়েছে গলা টিপে শ্বাস রুদ্ধ করে।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো। সে দাতে দাঁত পিষে বললো–উপযুক্ত সাজা না পেলে সমুচিত আক্কেল হবে না। রহমান, আমি চাই না আর একটি জীবনও বিনাশ হোক এভাবে।

বলুন সর্দার কি করতে হবে?

রহমান, সবচেয়ে বড় দুঃখ তোমার একটি হাত নেই!

বলুন সর্দার, আমি আমার এই একটি হাত দিয়েই সব পারবো।

পারবে তুমি কান্দাই সাগরে সাঁতার কাটতে, পারবে তুমি সাগরের তলদেশে গিয়ে কোনো কঠিন বস্তু তুলে আনতে?

জানি না পারবো কিনা তবে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না সর্দার।

এসো রহমান আমার সঙ্গে। কথা আছে। তারপর কায়েসের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুরকায়েস, তুমি লাশটি আমাদের শবাধারে রেখে দাও, তারপর সন্ধান

নাও তার ঠিকানা কোথায়। যদি সন্ধান পাও তবে লাশটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।

আচ্ছা সর্দার! কুর্ণিশ জানিয়ে বললো কায়েস।

বনহুর রহমানসহ চলে গেলো।

*

কায়েস অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই জাভেদ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো। বললো —— রহমান চাচা বাপুকে যখন সব বলছিলো আমি তখন শুনেছি। কায়েস চাচা, আমাকে তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুমতি দাও।

তা হয় না জাভেদ। আমাকে গোপনে কাজ করতে হবে, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার অসুবিধা হতে পারে।

কায়েস চলে গেলো।

জাভেদ চুপ থাকার লোক নয়। অশ্বশালায় প্রবেশ করে সে নিজের অশ্বটিকে বের করে আনলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো তার পাশে। জাভেদ আস্তানায় ফিরে আসার পর সব সময় ফুল্লরা তাকে চোখে চোখে রাখে, কারণ কখন আবার সে কোথায় চলে যাবে কে জানে।

ফুল্লরা আর জাভেদ ওরা দুজন যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। ফুল্লরা সর্বক্ষণ জাভেদকে ঘিরে থাকতো। যখন জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতো তখন ফুল্লরা থাকতো অপর একটা অশ্বপৃষ্ঠে। যদিও ফুল্লরার কোনো কথাই শুনতে না জাভেদ, তবুও ফুল্লরা তাকে নির্দেশ দিতো, জাভেদ ওদিকে যেওনা, ও পথ অত্যন্ত দুর্গম।

কতদিন ফুল্লরার কথা না শুনে অশ্ব নিয়ে ছুটতে জাভেদ সেই দুর্গম পথে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যেতো উপরে, খেয়াল করতো না কিছু।

ওপাশে গভীর খাদ।

হঠাৎ যদি খাদের মধ্যে পড়ে যায় কোনোক্রমে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য এবং সে মৃত্যু অতি ভয়ংকর। জাভেদকে কোনোক্রমে ফুল্লরা সামলাতে পারতো না।

উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাগরের পানিতে। সাঁতার কাটতো জলজীবের মত। ফুল্লরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে, ভাবতে ঠিক যেন সর্দারের প্রতিবিম্ব। ফুল্লরা সর্দারকেও দেখেছে সে কারও বারণ শুনে না, যা তার খেয়াল চাপে তাই সে করে। প্রাণের ভয় যেমন সর্দারের নেই তেমনি জাভেদের। ফুল্লরার তাই সবসময় দুশ্চিন্তা কখন কোথায় জাভেদ প্রাণ না হারায়।

অবশ্য এই ধরনের চিন্তা আস্তানার সবার মনে কারণ জাভেদের আচরণ স্বাভাবিক ছিলো না। গাছের ডালে ডালে এমনকি উঁচু পাহাড়-পর্বত, সাগর-সমুদ্র সব জায়গায় সে বিচরণ করে ফিরতো। কোনো বাধাই তার গতিরোধ করতে পারত না।

এহেন জাভেদ যখন তার অশ্ব জাম্বুর পিঠে চেপে বসলো তখন ফুল্লরা নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। সেও তার অশ্ব নিয়ে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো —জাভেদ, তুমি একা যেতে পারবে না, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

জাভেদ কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর অশ্ব জাম্বুর লাগাম টেনে ধরলো হাতের মুঠায়।

জাভেদ বনহুরের সব কথাই শুনেছিলো এবং মৃতদেহটা সে পূর্বেই দেখেছিলো। তখন তার মনে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। সত্যি এমন লোকও আছে যারা নিরীহ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে।

কে বা কারা তারা?

জাভেদের মনেও এ প্রশ্ন নাড়া দিয়েছে তাই সে জাম্বুকে নিয়ে ছুটলো।

ফুল্লরা চুপ থাকতে পারলো না, সেও অনুসরণ করলো জাভেদকে। জাম্বুর সঙ্গে ফুল্লরার অশ্বগতি ঠিক রেখে বলতে পারছিলো না, তাই অনেক পিছিয়ে পড়ছিলো ফুল্লরা।

কান্দাই জঙ্গল ছোট্টটি ছিলো না। কয়েক শ মাইল নিয়ে এ জঙ্গল। গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে ছিলো বনহুরের আস্তানা। কেউ কোনোদিন এ আস্তানার

সন্ধান পেতো না বা জানতো না। বহুবার বহু পুলিশমহল বনহুরের খোঁজে এই জঙ্গলে সন্ধান চালিয়েছে, কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি।

বনহুরের আস্তানা কেউ খুঁজে পায়নি তবে পুলিশ সুপার মিঃ জাফরী বনহুরের আস্তানার খোঁজ পেয়েছিলেন কিন্তু আস্তানায় পৌঁছতে সক্ষম হননি। পুলিশমহল বনহুরের অনুচরদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো চরমভাবে।

দুদিন পর ফিরে এলো কায়েস কিন্তু কোনো খোঁজই পায়নি সে কে বা কারা সেই নিরীহ ব্যক্তিটিকে হত্যা করেছিলো।

জাভেদ আর ফুল্লরাও তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছে কান্দাই জঙ্গলের ভেতরে। তারাও বিমুখ হয়েছে। অবশ্য জাভেদ আর ফুল্লরা সর্দারের অগোচরেই গিয়েছে এ কাজে।

তৃতীয় দিনে আবার একটি মৃতদেহ লটকানো দেখা গেলো কান্দাই জঙ্গলের দক্ষিণাঞ্চলে।

বনহুরের অনুচরগণ এ লাশটিও নিয়ে এলো সর্দারের সামনে।

নিরীহ ব্যক্তির নৃশংসভাবে প্রাণনাশ, সত্যি বড় বেদনাদায়ক। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হলো। পাশে দাঁড়িয়েছিলো নূরী, বনহুর বললো—এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে। নূরী, আমি যাবো, দেখবো কারা এরা এবং তারা আমাকে পেয়েও যদি এ নৃশংস হত্যালীলা বন্ধ করে তবু শ্রেয়।

পরদিনও আবার একটি লাশ বনহুরের সামনে হাজির করা হলো। মৃতদেহগুলোর চেহারার মধ্যে দারিদ্রতার ছাপ বিদ্যমান।

বনহুর সবগুলো অনুচর গোপনে ছড়িয়ে পড়লো কান্দাই জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু আশ্চর্য, কেউ সেই নির্মম হত্যাকারীকে খুঁজে পেলো না।

এমন কি জাভেদ এবং ফুল্লরাও কোনো হদিস করতে পারলো না।

বনহুর অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লো।

এমনভাবে পরাজয় বনহুরের কোনোদিন হয়নি। তারই সীমানার মধ্যে প্রতিদিন একটি করে নিরীহ মানুষের প্রাণহীন দেহ আবিস্কৃত হচ্ছে, এটা শুধু দুঃখজনক নয় অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

এ সংবাদ শহরে পৌঁছতে পারছে না, কারণ গভীর জঙ্গলে চলেছে এই হত্যা প্রতিযোগিতা। বনহুরের জীবনের বিনিময়ে এই হত্যালীলা। কে বা কারা এই নৃশংস কাজ করছে এখনও তার সঠিক হদিস খুঁজে পায়নি বনহুর।

চিন্তিতভাবে পায়চারী করছিলো বনহুর।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো তার পাশে কুর্ণিশ জানিয়ে।

রহমান ফিরে তাকালো, বললো—কি সংবাদ রহমান?

রহমান মাথা নিচু করে বললো—সর্দার, আজ আবার একটি লাশ পাওয়া গেছে কান্দাই জঙ্গলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। লাশটি একটি বড় পাথরচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো। তার গলায় ছিলো একটি চিঠি বাঁধা।

চিঠি!

হাঁ সর্দার।

ভাজকরা একটি নীল কাগজ বের করে বনহুরের হাতে দিলো।

বনহুর চিঠিখানা মেলে ধরলো চোখের সামনে। চিঠিখানা পূর্বের সেই ভাষায় লেখা==

"বনহুর তোমার জীবনকে তুমি এতো ভাল বাসো। এতগুলো প্রাণনাশ হলো তবু তুমি নিশ্চুপ রইলে। আমরা জানতাম তুমি নিজের জীবনের চেয়ে অসহায় মানুষকে। বেশি ভালবাসো। এটাই কি তার প্রমাণ?"

হঠাৎ বনহুর তার স্বভাবসুলভ হাসি হেসে উঠলো।

অবাক চোখে তাকিয়ে বললো রহমান—ওতে কি লেখা আছে সর্দার?

জোরদার ওষুধ প্রয়োগ করেছে হত্যাকারী। এ নরশয়তান সত্যি বড় চালাক।

হা সর্দার। আমরা এতগুলো লোক কান্দাই জঙ্গলটা চষে ফিরলাম তবুও এই হত্যার কোনো হদিস খুঁজে পেলাম না। হত্যাকারী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সতর্কতার সঙ্গে তার কাজ করে চলছে।

ঠিক বলছো রহমান।

সর্দার, আজ আমরা কান্দাই সাগরতীরে যাবো। সেখানে আমাদের জাহাজ উল্কা অপেক্ষা করছে। আমরা সাগরের বুকেও সন্ধান চালাবো।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। এই নরপশুরা কোন জলযানে আত্নগোপন করে এই হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে। রহমান, তোমার একটা হাত নেই তাই মাঝে মাঝে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি...

সর্দার, আমার জন্য আছে আপনার আশীর্বাদ। এই একটি হাতই আমার যথেষ্ট। আজই আমরা রওয়ানা দেবো সর্দার এবং আশা করি হত্যাকারীদের খুঁজে পাবো। সর্দার, কায়েস কি আমাদের সংগে যাবে?

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ সময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলো একজন অনুচর, বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার, জাভেদ আর ফুল্লরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বনহুর বললো–হয়তো প্রতিদিনের মত আজও তারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

না সর্দার, তারা দুদিন হলো ফিরে আসেনি। আমরা আপনাকে জানাবার পূর্বে বহু সন্ধান করেছি কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া গেলো না।

তারা প্রতিদিন ফিরে আসতো।

হাঁ। প্রতিদিন তারা ফিরে আসতো কিন্তু...

এমন সময় নূরী আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে প্রবেশ করলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললোবনহুর, কাল থেকে জাভেদ আর ফুল্লরা ফিরে আসেনি। নিশ্চয়ই সেই হত্যাকারীদল আমার জাভেদ আর ফুল্লরাকে হত্যা করেছে।

বনহুর আনমনা হয়ে পড়লো।

তাকালো সে নূরীর মুখের দিকে। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–তাজকে প্রস্তুত করো রহমান, আমি দেখবো কোথায় জাভেদ আর ফুল্লরা।

সর্দার, এ সময় আপনার বাইরে যাওয়াটা…

তোমরা আমাকে বাধা দিও না, যাও।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললো–হুঁর, তুমি যাবে? ওরা যে তোমাকে পাবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করেছে।

এ মুহূর্তে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না। আমাকে তোমরা বাধা দিও না।

কিন্তু….

না, কোনো কিন্তু নেই।

বেশ যাও, তবে যাওয়ার পূর্বে তুমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করে যাবে। তার দোয়া তোমার পাথেয়…

তোমার কথা আমি মেনে নিলাম নূরী।

রহমান এসে জানালো–সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

বনহুর তার রিভলভারখানা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো তারপর বললো–নূরী চললাম।

এসো? খোদা হাফেজ।

বনহুর রহমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

নূরীও অনুসরণ করলে তাদের কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখলো বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

বনহুর আর রহমান চলে গেলো।

নূরী আঁচলে চোখ মুছে ফিরে দাঁড়ালো।

দেখলো নাসরিনও দাঁড়িয়ে আছে অদূরে।

নূরীকে দেখে এগিয়ে এলো নাসরিন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—সরদারকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হলো না নূরী।

কি করবো বল ওকি কারো মানা শুনবে? জানি ওকে পাকড়াও করবার জন্যই কোনো ষড়যন্ত্রকারী দল নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে।

হাঁ কথাটা আমিও শুনেছি কিন্তু সর্দারের জীবননাশ করে তাদের লাভ কি?

এত সহজ কথাটা তুই বুঝিস না নাসরিন!

আমি কিছু বুঝতে পারছি না নূরী, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্রতিদিন এই মৃতদেহগুলো আমার মনকে ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে। জানি না জাভেদ আর ফুল্লরার কি অবস্থা হয়েছে। আমার মন বলছে ওরা বিপদে পড়েছে।

নাসরিনের কথায় নূরী আনমনা হয়ে যায়! সত্যি জাভেদ আর ফুল্লরা কি তবে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না?

এখানে যখন নাসরিন আর নূরী জাভেদ আর ফুল্লরাকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে, তখন কান্দাই সাগরের বুকে একটা জাহাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে হীরা নগরীর দিকে।

জাহাজখানা যাত্রীবাহী নয় মালবাহী আকার বৃহৎ নয় মাঝারি। মাত্র কয়েকজন খালাসি এবং সারেঙসহ জাহাজখানা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

মালবাহী জাহাজখানাতে কোনো পেট্রোল এবং তাম্রপাত ছিলো। কান্দাই সাগর অতিক্রম করার পর হীরা নগরী বা হীরা বন্দর। জাহাজখানা হীরা বন্দরে প্রথমে নোঙ্গর করবে তারপর পুনরায় ফিরে আসবে কান্দাই বন্দরে।

এই জাহাজখানা যখন কান্দাই বন্দর ত্যাগ করে তখন জাহাজে কোনো পেট্রোল বা তাম্রপাত ছিলো না। এই জিনিসগুলো উঠানো হয়েছে কোনো এক

গোপন স্থান হতে। জাহাজের খোলের তলদেশে একটা ডুবু বাক্স আছে, তার মধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে জাভেদ আর ফুল্লরাকে।

*

বনহুর তার ডুবুজাহাজে বসে টেলিভিশন পর্দার সুইচ অন করে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দায় ভেসে উঠলো সেই জাহাজখানা, যে জাহাজখানা দ্রুত কান্দাই সাগর ত্যাগ করছিলো।

বনহুর বললো–রহমান, তুমি যা আঁচ করেছিলে তাই ঠিক। সামনের জাহাজখানার মধ্যেই আছে কোনো গোপন রহস্য।

সর্দার, ঐ জাহাজখানার গতিবিধি সন্দেহজনক এবং আমি গোপনসূত্রে তা জানতে পেরেছি। আর সে কারণেই আপনাকে আমি একা ছেড়ে দেইনি। সর্দার, ঐ জাহাজের মধ্যেই আছে কান্দাই জঙ্গলে হত্যারহস্যের সব রহস্য।

তা ছাড়া আরও কিছু থাকতে পারে রহমান। যেমন জাভেদ আর ফুল্লরার সন্ধানও পেতে পারি আমরা ঐ জাহাজটার মধ্যে। রহমান।

বলুন সর্দার?

টেলিভিশন পর্দায় লক্ষ করো ঐ জাহাজখানার তলদেশে একটা ঝুলন্ত বাক্স অথবা ঐ ধরনের কিছু নজরে পড়ছে। ভালভাবে লক্ষ কর রহমান।

হাঁ আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি জাহাজখানার তলদেশে একটা ঝুলন্ত বাক্স বা বস্তু রয়েছে।

রহমান, আমাদের জাহাজখানা যে ঐ জাহাজখানাকে অনুসরণ করছে এটা যেন তারা বুঝতে না পারে।

পারবে না সর্দার, আমরা ওদের জাহাজ থেকে প্রায় কয়েক শ’ রশি দূরে আছি। তা ছাড়া আমাদের জাহাজখানা ডুবুজাহাজ তা ওরা কোনোক্রমে টের পাবে না……।

রহমান, তুমি যা মনে করেছে তা নয়, কারণ ওরা যেভাবে জাহাজের গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ওরা আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে।

সর্দার, ওরা যদি কোনোক্রমে টের পেয়ে থাকে তাহলেও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না ওরা আমাদের।

হাঁ সে কথা সত্য তবে ধূর্ত নরশয়তানদের চক্রান্তের শেষ নেই।

সর্দার, আমাদের আশংকা হচ্ছে ওরা সুকৌশলে আপনাকে…

কিছু ভেবোনা রহমান, আল্লাহ আমাদের সহায়। সাগরের বুকে জমাট অন্ধকার নেমে আসছে তাই কিছুটা চিন্তিত হচ্ছি। ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায়।

ঐ মুহূর্তে ডুবুজাহাজের ক্যাপ্টেন ছুটে এলো, কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, ঐ জাহাজখানার অদূরে একটি ছোট্ট ডুবুনৌকা দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় ওরা টের পেয়ে গেছে, এ কারণে কোনো গোপন বস্তু ওরা সরিয়ে ফেলতে চায়।

বনহুর সামনের টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রেখে বললোহ, তুমি যা বলেছে তা সত্য। তিমি আকারের একটি ছোট্ট জলযানের হঠাৎ আবির্ভাব হলো। নিশ্চয় কোনো মতলব আছে ওদের।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো এবার আমার ক্ষুদে জলযানটি বের করবার নির্দেশ দাও রহমান। দেখবো ওরা কেমন করে সরে পড়ে।

সর্দার।

কোনো কিছু ভেবো না রহমান, আল্লাহ ভরসা……

বনহুর তার ডুবুরী পোশাক পরে নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

*

জাভেদ আর ফুল্লরার হাত সংযুক্ত অবস্থায় বাঁধা ছিলো। ওরা পড়েছিলো জাহাজটার তলদেশে একটা ছোট্ট জলযানের মধ্যে। আজ দু'দিন তাদের পেটে খাবার পড়েনি। অসহায় করুণ অবস্থা হলেও একটুও দমে যায়নি জাভেদ। তার মুখমন্ডল তেজদীপ্ত, বলিষ্ঠতার ছাপ।

ফুল্লরার দক্ষিণ হাতখানা মুক্ত ছিলো।

সে জাভেদের বুকে হাত বুলিয়ে বললো—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

জাভেদ কোনো জবাব দিলো না।

ফুল্লরা বললো–আমরা ভাবতেই পারিনি গহন জঙ্গলে এমনভাবে আগাছা দিয়ে গর্তটাকে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। জাভেদ, কোনো কথা কি তোমার বলার নেই?

জাভেদ তবুও নীরব।

বললো ফুল্লরা–জানো আমাদের হত্যা করা হবে।

জাভেদ কিছুটা সোজা হয়ে বসলো, এখনও তার দৃষ্টিতে নেই কোনো যন্ত্রণার ছাপ। তাকালো জাভেদ ফুল্লরার দিকে। কিন্তু সে ফুল্লরার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ফুল্লরাও দেখতে পাচ্ছে না ভালভাবে জাভেদকে। হাতের ছোঁয়ায় ওরা উভয়ে উভয়কে অনুভব করছে।

ফুল্লরা বললো—জাভেদ আমার জন্য আমি মোটেই ভাবছি না। ভাবছি তোমার জন্য......

এবার কথা বললো জাভেদ—কেন?

তুমি কিছু বোঝো না?

ক্ষুধায় পেট জ্বালা করছে তাই কিছু ভাবতে পারছি না। কোনো কথা ভাল লাগছে না আমার। উঃ! কি উকট শব্দ জাহাজটার!

জাভেদ, কে বলে তুমি কথা বলতে জানো না। এই তো সুন্দর করে বলছো। জাভেদ তোমাকে যদি ওরা আমার সামনে হত্যা করে তাহলে আমি সহ্য করতে পারবে না, বরং আমাকে যদি ওরা আগে হত্যা করত তাই ভাল ছিলো।

হত্যা ওরা আমাদের করবে না।

সত্যি বলছো জাভেদ?

হা।

হত্যা করলে প্রথম বন্দী করার পরই ওরা আমাদের জীবন নাশ করতো।

এ কথা অবশ্য সত্য এবং হত্যা করার পর কান্দাই জঙ্গলে কোনো এক স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে...উঃ! কথাটা ভাবতেও ভয় হয়। জানি আর কোনোদিন আমরা মুক্তি পাবে কি না? জাভেদ! জাভেদ...বলো তুমি আমাকে ভালবাসো? বলো একবার মৃত্যুর পূর্বে শুনতে চাই তুমি আমাকে ভালবাসো কিনা?

এই মৃত্যুমুহূর্তে ওসব কথা নাইবা শুনলে ফুল্লরা।

তবুও সান্ত্বনা পাবো তুমি আমাকে ভালবাসতে......জাভেদ কথা বলো, চুপ করে থেকো না।

ফুল্লরা

! বলো?

এই তো জীবন। জানি না আমরা এখন কোথায়? গর্তটার মধ্যে পড়ে যাবার পর আমাদের সমস্ত শরীর জাল দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিলো, আমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি, তারপর আর কিছু মনে নেই। জানি না আমরা এখন কোথায়?

জাভেদ, কুচক্রীদল আমাদের বন্দী করে এমন কোনো স্থানে এনেছে যে স্থান যমালয়ের চেয়ে ভয়াবহ। এখন আমরা একটি জাহাজের তলদেশে রয়েছি। যে কোনো সময় আমাদের জলযানটা জাহাজের চাকার তলে পিষে যেতে পারে।

ফুল্লরার কথা শেষ হয় না, তাদের জলযানটা হটাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠলো তার পর পরই ফুল্লরা ও জাভেদ উল্টেপড়ে গেলো এ ওর ওপর।

জলযানটা হঠাৎ জাহাজখানার তলদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থা হলো। বাক্স বা যানটার মধ্যে ছিলো অক্সিজেন ভর্তি তাই জীবনে বেঁচে রইলো ওরা।

জলযানটা সাগরের বুকে প্রচন্ড ঢেউয়ের বুকে একবার ভেসে উঠছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। জাভেদ আর ফুল্লরার অবস্থা শোচনীয়।

ফুল্লরা বারবার জাভেদকে আঁকড়ে ধরছে, যেন ওরা জলযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

*

বনহুর ডুবুরীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিলো।

সামনে টেলিভিশন পর্দায় তার দৃষ্টি, ভুলে গেছে বনহুর তার জীবননাশের জন্য শত্রুপক্ষের প্রচেষ্টা। তাকে কৌশলে বের করে আনা হয়েছে তার আস্তানা হতে। ষড়যন্ত্রকারিগণ অত্যন্ত ধূর্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান ফিরে এলো টেলিভিশন ক্যাবিনে। কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—সর্দার, সাবমেরিন তৈরি, ক্ষুদে জলযান অকেজো হয়ে পড়েছে।

বেশ, সেই ভাল। ক্ষুদে জলযানের চেয়ে আমার জন্য সাবমেরিন বেশি ভালো। কথাগুলো বলে বনহুর বেরিয়ে এলো টেলিভিশন ক্যাবিন হতে।

রহমান বনহুরকে সাবমেরিনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলো সেই ক্যাবিনে যে ক্যাবিনে টেলিভিশন পর্দায় সাগরতলে সবকিছু পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। টেলিভিশন পর্দার পাশেই ছিলো কয়েকটি সুইচ। প্রথম সুইচ অন করলে সাগরের উপরিভাগের সবকিছু পর্দায় পরিলক্ষিত হবে। দ্বিতীয় সুইচে সাগরের তলে সবকিছু ধরা পড়বে টেলিভিশন পর্দায়।

রহমান সর্দারকে সাবমেরিনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো এবং সাগরতলের দৃশ্য লক্ষ করার জন্য দ্বিতীয় সুইচ অন করে ঠিকভাবে লক্ষ করতে লাগলো।

সামনের জাহাজখানা বহুদূর এগিয়ে গেছে। তারা কোনো ক্রমে আঁচ করে নিয়েছে তাদের জাহাজখানাকে কেউ অনুসরণ করছে এবং সে কারণেই জাহাজের তলদেশে যে বাক্সে অক্সিজেন ভরে তার মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলো জাভেদ ও ফুল্লরাকে, সেই বাক্সের শিকল খুলে দিয়েছিলো ষড়যন্ত্রকারীদল।

রহমান টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পাচ্ছে সাবমেরিনটা উল্কাবেগে অগ্রসর হচ্ছে। আরও লক্ষ করলো সামনের জাহাজ থেকে বাক্সটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং সেটা ঢেউয়ের বুকে একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে, এইভাবে দ্রুত জাহাজখানা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সাবমেরিনে সর্দার এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজখানার দিকে। উদ্দেশ্য জাহাজখানাকে ঘায়েল করা এবং জাহাজের অভ্যন্তরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে উদঘাটন করা।

কিন্তু রহমান যা লক্ষ করলো সেটা ভাববার বিষয়। কারণ বাক্সটার মধ্যে কি আছে জানে রহমান কিংবা বনহুর। বাক্সটাকে জাহাজ থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো এটা ঠিক বুঝতে পারলো রহমান।

তার মুখমন্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো।

পাশে আরও দুজন অনুচর ছিলো, তারাও লক্ষ করছিলো টেলিভিশন পর্দায়। তাদের সঙ্গে রহমান আলোচনা করলো এ ব্যাপার নিয়ে!

একজন অনুচর বলালো-রহমান ভাই, ওয়্যারলেসে তুমি সর্দারকে জানিয়ে দাও জাহাজ থেকে যে বাক্সটা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো সেটা কি এবং কেন সেটা সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

বললো রহমান–সর্দার, যা ভাল মনে করবেন তাই হবে। এ মুহূর্তে চাই না তাকে অন্যমনস্ক করি। তবে বাক্সটার মধ্যে এমন কোনো বস্তু ছিলো যা তারা সাগরজলে নিক্ষেপ করলো।

অপর জন বললো—হয়তো মূল্যবান কোনো সম্পদ হবে।

প্রথম জন বললো—যেতে দাও। আমাদের সর্দারের জীবনের চেয়ে কোনো সম্পদই। মূল্যবান নয়। দেখো রহমান ভাই, সর্দার তার যান নিয়ে জাহাজখানার অতি নিকটে পৌঁছে গেছে।

হাঁ আর বিলম্ব নয়। ওয়্যারলেসে মুখ রেখে ডুবুজাহাজের চালকগণকে বললো রহমান আমাদের জাহাজখানাকে সোজা ঐ জাহাজখানার দিকে নিয়ে চলল।

ভেসে এলো হেডচালকের কণ্ঠস্বর–হাঁ, আমরা ঠিকভাবে কাজ করছি..

হঠাৎ রহমান ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো—মাহবুব, ওরা সর্দারের সাবমেরিন লক্ষ্য করে জাহাজ থেকে কোনো বস্তু নিক্ষেপ করছে।

সর্বনাশ! আমরাও দেখতে পাচ্ছি, ..সর্দারের কোনো বিপদ না ঘটে। ঐ দেখো রহমান ভাই, আবার একটা অগ্নিগোলক নিক্ষিপ্ত হলো জাহাজখানা থেকে।

আমারও কেমন যেন ভয় হচ্ছে মাহবুব। বললো রহমান।

টেলিভিশন পর্দায় বারবার ওরা লক্ষ করছে এই ভয়ংকর দৃশ্য। জাহাজটি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার উপরিভাগ হতে কামানের গোলার মত অগ্নিগোলা ছুটে আসছিলো বিক্ষিপ্তভাবে।

গভীর সাগরের তলদেশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুরের সাবমেরিনখানা। তাই অগ্নিগোলক ঠিকভাবে এসে সাবমেরিনে আঘাত হানতে পারছে না।

বনহুর কৌশলে সাবমেরিন চালনা করছিলো।

বনহুর লক্ষ করেছিলো জাহাজখানার তলদেশ হতে একটি কালো রঙের বাক্স বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে তলিয়ে গেলো। এ বাক্সটাতে কি আছে বনহুরও ঠিক আঁচ করতে সক্ষম হলো না। তার লক্ষ জাহাজখানাকে ধ্বংস করে দেয়া, কারণ জাহাজখানাকে শত্রুপক্ষের জাহাজ বলে বনহুর আন্দাজ করে নিয়েছিলো।

অবশ্য বনহুরের সন্দেহ সত্য। কারণ এই জাহাজখানার মালিক বি, কে চৌধুরী। তার এ জাহাজখানা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকখানা জাহাজ কান্দাই সাগর এবং ঝাম সাগরে চলতো। এগুলোতে নানা ধরনের অসৎ ব্যবসার ঘাঁটি ছিলো। বি, কে চৌধুরী চতুর এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলো। কান্দাই সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সুকৌশলে হাত করে নিয়ে যা খুশি তাই করতো এই নরশয়তান, কেউ তার কাজে বাধা দিতে সাহসী হতো না। কারণ বি, কে চৌধুরী একজন সুদক্ষ খুনী ছিলো। কেউ চাইতো না তার কাজে বাধা দেয় বা সমালোচনা করে। যদি কেউ কোনোদিন দুঃসাহস নিয়ে কিছু বলতো বা সরকারের নিকটে নালিশ জানাতে, পরদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। হয় তো বা চিরদিনের জন্য নিখোঁজ হতো, নয়তো সাগরের নোনা পানিতে তার মৃতদেহ ভেসে বেড়াতো।

এহেন কারণে কান্দাইবাসী এবং আশেপাশের দেশগুলোর লোকজন বি, কে চৌধুরীকে সমীহ করে চলতো।

এই সময় বনহুর কান্দাই ছিলো না, এজন্যই বি, কে চৌধুরী আরও বেশি সুবিধে করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। তবে একটা ভয় বি, কে চৌধুরীর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতো, সে হলো বনহুরের ভয়। তার পার্টনার মিঃ হ্যারিসন রায় এ কথা ভালভাবে মিঃ বি, কে চৌধুরীকে জানিয়ে দিয়েছিলো, বন্ধু সবার চোখে ফাঁকি দিলেও একজনের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না, সে হলো দস্যু বনহুর!

বি, কে চৌধুরীর ব্যবসা ছিলো লাল দ্বীপে এবং তার শাখা-প্রশাখা ছিলো বিভিন্ন দেশে। কান্দাই শহরে তাদের ব্যবসা ভাল চলছে, কাজেই তাদের হেড অফিস এ দেশের আশেপাশে কোন গোপনীয় স্থানে হাওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংবাদ শুনে বি, কে চৌধুরী কান্দাই চলে এলো এবং সন্ধান নিয়ে বুঝতে পারলো এ কথা সত্য, তাদের ব্যবসা কান্দাই এবং তার আশেপাশের দেশগুলোতে ভাল চলবে।

সাধুতার মুখোশ পরে বি, কে চৌধুরী কান্দাই সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং কৌশলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো।

সরকারের দলে যারা সৎ মহৎ তাদের সঙ্গে মনের মিল হলো না। হৃদ্যতা জমলো না ভালভাবে। আর যারা বিড়ালতপস্বী সেজে গদিতে বসে জনদরদী বন্ধুর অভিনয় করে যাচ্ছিল, বি, কে চৌধুরী তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো। তারপর নিজেও নাম কিনলো দাতা এবং জনদরদী হিসেবে।

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ অসহায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলো প্রকাশ্য দাতা হিসেবে। পথঘাট, হাপসপাতাল, দাঁতব্য চিকিৎসালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে দিলো বি, কে চৌধুরী। জনসমাজে তার প্রশংসার অন্ত ছিলো না। সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। কিন্তু তার কালো থাবা সবার অজ্ঞাতে শোষণ করে চললো মানুষের তাজা রক্ত।

কান্দাই সরকার আঁচ না করলেও আঁচ করলো দেশের জনগণ। তারা পূর্বের মত নির্বোধ রইলো না, কোথাকার পানি কোথায় যাচ্ছে সব টের পেয়ে গেলো তারা। কিন্তু টের পেলেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

মাঝে মাঝে গোপন বৈঠক বসতো জনদরদী নেতাদের মধ্যে। তারা জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও হতাশ হলো না, কারণ তারা জানে

এদের কর্মক্ষমতা কতটুকু। এরা শুধু চিৎকার করে মরবে, রক্ত দেবে, প্রাণ হারাবে কিন্তু আসল জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

দ্রব্যমূল্য থোক না দ্বিগুণ তাতে দেশের জনগণ মরবে, নেতাদের কিছু যায় আসে না। তারা গদিতে বসেই আখের গুছিয়ে নিয়েছে সম্পদের সিংহাসনে উপবেশন করে রঙিন স্বপ্ন দেখছে! মরুক না দেশের মানুষ, তাতে তাদের কিছু ক্ষতি হবে না।

এ ভরসা নিয়েই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গদি আঁকড়ে ধরে সাধুতার মুখোশ পরে দিনাতিপাত করে চলেছিলো। একদিন তাদের আসন টেলে উঠতে পারে, একদিন তাদের গলা টিপে পথের ধারে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে, এ কথা স্মরণ না হলেও মাঝেমধ্যে অন্তরের গহনে একটা দুর্বরতা উঁকি ঝুঁকি মারতো এবং তখনই বি, কে চৌধুরীর বুকটা কেঁপে উঠতো নিজের অজ্ঞাতে। সবার চোখে ধুলো দিলেও বনহুরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, এ কথা জেনে নিয়েছিলো গোপন সূত্রে।

তাই বনহুরকে এত ভয় অসৎ ব্যক্তিদের বি, কে চৌধুরীও এই কারণেই কৌশল অবলম্বন করেছিলো লালদ্বীপ থেকে এসেই–কেমন করে বনহুরকে পৃথিবীর বুক থেকে সরানো যাক। ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তারা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। পথের কাঁটা দূর হবে চিরদিনের মত।

অসৎ যারা তারা সর্বকাল বেঁচে থাকবে বলে নিজেরা মনে করে। পরকাল বলে তারা কোনোদিন ভয় পায় না এবং মনেও স্থান দেয়া আর পরকাল নিয়ে ভাবার সময়ই বা তাদের কোথায়। সব সময় অর্থ আর ঐশ্বর্যের চিন্তা, কেমন করে ইমারত গড়া যাবে, কেমন করে ছেলেমেয়েদের নেতা বানানো যাবে, কেমন করে গড়ে উঠবে নাম যশ খ্যাতি। অহরহ তাদের মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ভাববার অবসর নেই, একদিন পরপারের ডাক আসবে। একদিন সবকিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। এমন কোনো বাধাই সেদিন ধরে রাখতে সক্ষম হবে না, এমন কোন মহাওষুধ নেই যা চিরদিন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

দুনিয়ার মোহ অত্যন্ত জঘন্য-মানুষ ভুলে যায় ন্যায়-নীতি এমন কি সততা-সভ্যতা মানবতা পরিণত হয় নরপশুত্বে মানুষ রূপি জানোয়ারের।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা পশুর চেয়েও অধম সত্যি, তাদের জন্য করুণা হয়।

বি, কে চৌধুরী একজন এই শ্রেণীর মানুষনামী জীব। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অনেকে তার সঙ্গে হাতে হাত মেলায়। জ্ঞান গরিমায় বড় হয়েও তাকে সমীহ করে অনেকেই, কারণ তার আছে দুষ্টবুদ্ধি এবং প্রচুর সম্পদ। অবশ্য লোভ-লালসায় যারা অন্ধ এই শ্রেণীর লোকগুলোই এগিয়ে আসে বি, কে চৌধুরীর মত লোকের সঙ্গে একান্ত হতে।

এহেন বি, কে চৌধুরী যখন জানতে পারলো বনহুর তার প্রধান শত্রু তখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ঘায়েল করার জন্য প্রস্তুত হলো আর সে জন্যই সে পরম যত্নে শুরু করলো নরহত্যা। বনহুর সম্বন্ধে বি, কে চৌধুরী জেনে নিয়েছিলো ভালভাবে, কোন অস্ত্রে তাকে কাবু করা যাবে?

বনহুর অসহায় দুঃস্থ মানুষের বন্ধু তাই বি, কে চৌধুরীর পরামর্শ দাতাগণ তাকে সেই পরামর্শই দিলো যা বনহুরকে বিভ্রান্ত করবে।

বি, কে চৌধুরী পরামর্শদাতাগণ বিফলকাম হয়নি। তারা যে পরামর্শ দিয়েছিলো তাই সফল হতে চলেছে, বেরিয়ে এসেছে বনহুর তার আস্তানা হতে।

বনহুর জানে না কে সেই জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি যে তাকে বি, কে চৌধুরীর দুর্গম কারাকক্ষ হতে মুক্ত করে আনতে সক্ষম হয়েছিলো এবং সেই দুর্গম কারাকক্ষে বন্দী করে বি, কে চৌধুরীকে।

নয়শয়তান মুক্ত হয়ে এসেছে তার সেই দুর্গম কারাকক্ষ হতে। জমকালো পোশাক পরিহিতা কারাকক্ষের দ্বার বাহির হতে রুদ্ধ করে দিলেও গোপন কোনো পথ ছিলো যা বনহুর অথবা জমকালো পোশাক পরিহিতার জানা ছিলো না। সেই পথে বেরিয়ে এসেছে বি, কে চৌধুরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য বনহুর আর সেই অদ্ভুত নারীমূর্তি ভালভাবেই পরীক্ষা করেছিলো সেই দুর্গম কারাকক্ষের মধ্যে কোনো গোপন পথ আছে কিনা। বনহুরকে যখন সেই কারা কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তখন বেশ বোঝা যায় তার কোনো গোপন দরজা নেই বা ছিলো না। থাকলে বনহুরকে ঐ কারাকক্ষে বন্দী করে রাখার সাহসী হতে না বি, কে চৌধুরীর। বনহুরকে বন্দী করে রাখা কত কঠিন তা তার জানা ছিলো। কিন্তু সেই কারাকক্ষ হতে চৌধুরী বেরিয়ে এসেছে এটা বিস্ময়কর বটে।

বনহুরের সাবমেরিন যখন জাহাজখানার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন বৃহৎ আকার একটি লৌহজাল তার সাবমেরিনটাকে ঘিরে ফেললো। এমন একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর, তবুও সে সাবমেরিনসহ বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালালো। কিন্তু সফলকাম হলো না। হঠাৎ তার সাবমেরিনখানা উল্টে গেলো।

বনহুর কৌশলে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে পড়লো।

তার সঙ্গে ছিলো এমন একা অস্ত্র যা দিয়ে সে অতি সহজে লৌহশিক অথবা ঐ ধরনের মজবুত কোনো বস্তু নষ্ট করে দিতে পারে। বনহুর তার সাবমেরিনটার আশা ত্যাগ করে সেই অস্ত্রধারা লৌহজাল কেটে বেরিয়ে পড়লো।

বনহুরের দেহে ছিলো ডুবুরীর পোশাক তাই কোনো অসুবিধা হলো না তার। সাঁতার কেটে বেরিয়ে এলো সে লৌহজালটার মধ্য হতে।

রহমান তাদের ডুবুজাহাজ থেকে এ দৃশ্য লক্ষ করলো এবং সে বিচলিত হল ভীষণভাবে। পুনরায় একটি জলযান নিয়ে রহমান রওয়ানা দেবে ঠিক সেই মুহূর্তে রহমান লক্ষ করলো একটা অদ্ভুত ডুবু জলযান এগিয়ে আসছে বনহুরের দিকে। বিস্ময় নিয়ে দেখছে রহমান ও তার সাথীরা।

বললো মাহবুব–রহমান ভাই, একি ব্যাপার? এটা কি সর্দারকে আক্রমণ করবে?

হয়তো ঐ জাহাজ থেকেই এই জলযান বেরিয়ে এসেছে। সর্দারকে আক্রমণ করবে বলে মনে হচ্ছে .....নইলে ওভাবে এগিয়ে আসতো না। কথাগুলো রহমান টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রেখে বললো।

অপর একজন অনুচর বলে উঠলো–রহমান, ঐ জলযানটি সর্দারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কিন্তু কোনোরকম আক্রমণ না চালিয়ে গতি মন্থর করে নিয়েছে.......ঐ দেখ জলযানটি সর্দারকে তুলে নিলো কৌশলে।

হাঁ, তাই তো দেখছি.....

তবে কি সর্দারকে ওরা পুনরায় বন্দী করলো?

মনে হচ্ছে তাই....।

রহমান ভাই আর বিলম্ব না করে আমরা আক্রমণ চালাবো। কিছুতেই সর্দারকে বিপদগ্রস্ত হতে দেবো না আমরা।

ঠিক বলেছো মাহবুব, আর দেরী করা উচিত হবে না! সর্দারকে ওরা বন্দী করেছে এবার, ঐ দেখো জলযানটি দ্রুত সরে যাচ্ছে অপর দিকে।

রহমান ভাই, এবার নির্দেশ দাও কিভাবে আমরা আক্রমণ চালাবো আমরা কি ডুবুজাহাজাখানা থেকে রকেট ছুড়বো...।

মাহবুব, তাহলে তো সর্দারসমেত ঐ অদ্ভুত জলযানটি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। সর্দারকে হারাবো, তার চেয়ে আমি ক্ষুদে জলযানটি নিয়ে আক্রমণ করতে পারি। এত সহজে সর্দারকে আমরা বন্দী হতে দেবো না। কিন্তু একি, জলযানটি অত্যন্ত দ্রুত সাগরতলে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সর্বনাশ হলো রহমান ভাই, আমরা সরদারকে হারালাম। এমন ভাবে শত্রুপক্ষ প্রস্তুত ছিলো যার জন্য আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

রহমান দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন নিয়ে বেরিয়ে এলো ডুবুজাহাজ থেকে। সহকারীদের কোনো বাধাই সে শুনলো না। সোজা সে আক্রমণ চালালো সামনের জাহাজটির তলদেশে। রহমানের চেষ্টা ব্যর্থ হলো না, জাহাজখানার তলদেশ ফেসে গেলো এবং দ্রুতগতিতে জাহাজখানা তলিয়ে যেতে শুরু করলো।

রহমানের সাবমেরিনও ঘায়েল হলো, রহমানও সামান্য আহত হলো।

তবু সে ফিরে আসতে সক্ষম হলো তাদের ডুবুজাহাজে। সাবমেরিনের কিছু ক্ষতি সাধন হয়েছে বটে তবে তেমন কোনো কিছু অকেজো হয়নি।

রহমানের সহকারিগণ তাকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালো। জাহাজখানাকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছে রহমান, এটাই তার বড় আনন্দ। রহমান তার একটি হাত ব্যবহার করেই জয়যুক্ত হলো, এটা তাদের সবার খুশির কথা।

কিছুটা ঘায়েল হলেও রহমান ভেঙে পড়েনি। তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানোর পর এসে বসলো সে তাদের টেলিভিশন পর্দার সামনে। সর্দারের চিন্তা যদিও তাকে ভীষণাবে চিন্তিত করে তুলেছিলো তবুও সামনের জাহাজখানাকে ফাঁসিয়ে

দিতে পারায় খুব খুশি লাগছিলো তার। জাহাজখানা মাঝ দরিয়ায় অসহায় অবস্থায় তলিয়ে যাচ্ছে।

রহমান ও তার সহকারিগণ দেখতে পেলো কিছু লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করছে এবং জলযান নিয়ে কয়েকজন সাগরের বুকে নেমে পড়লো।

জাহাজখানা প্রায় তলিয়ে গেছে, আর কিছু সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান বলে উঠলো– মাহবুব, তুমি যাও, আমাদের স্পীডবোট নিয়ে ওদের আক্রমণ করো এবং বন্দী করে আনন।

আচ্ছা রহমান ভাই, তোমার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করবো। রহমানকে কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো মাহবুব।

ডুবুজাহাজ নিয়ে রহমান এতক্ষণ সাগরতলে একটি জায়গায় স্থিরভাবে থেকে কাজ করছিলো, এবার জাহাজখানা এগিয়ে নেয়ার জন্য চালকদের নির্দেশ দিলো।

মাহবুব জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে এলো স্পীডবোট নিয়ে। তার সংগে জবরু আর মতিলাল রইলো। তাদের প্রত্যেকের সংগে আগ্নেয়াস্ত্র।

স্পীডবোটখানা স্বাভাবিক ছিলো না। সমস্ত স্পীডবোটখানা প্লাস্টিক কভারে মোড়া ছিল, একবিন্দু পানিও ভেতরে প্রবেশের কোনো উপায় ছিলো না!

মাহবুব, জবরু আর মতিলাল স্পীডবোট নিয়ে সাগরের বুকে ভেসে উঠলো এবং ধাওয়া করলো সেইদিকে যেদিকে জাহাজ থেকে পলাতক ব্যক্তিগণ স্পীডবোটে পালাতে যাচ্ছে।

মাহবুব দক্ষ অনুচর, তার নিপুণ কার্যদক্ষতার জন্য বনহুর তাকে ডুবুজাহাজে সঙ্গী করে নিয়েছে, কাজেই মাহবুব কৌশলে পলাতকদের পাকড়াও করার জন্য মরিয়া হয়ে তার স্পীডবোট চালনা করে চলল।

ওদিকে বাক্সটা যা জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিলো, যার মধ্যে রয়েছে জাভেদ আর ফুল্লরা, সেই বাক্সটা সাগরের বুকে ঢেউয়ের মাথায় কখনও ডুবছে কখনও ভেসে উঠছে-এইভাবে চলছিলো।

ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে উঠেছে ওরা দুজন।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে জাভেদ আর ফুল্লরা। বাক্সটা ভেসে চলেছে তো চলেছেই। রাতদিন কিছু বুঝতে পারছে না তারা।

জাভেদ বললো–ফুল্লরা, আর কতক্ষণ এভাবে বাচবো আমরা?

ফুল্লরা বেশি নেতিয়ে পড়েছে, তার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না, তবুও বাঁচার জন্য কত না প্রচেষ্টা! জাভেদকে সুন্দরভাবে কথা বলতে দেখে ফুল্লরা এত বিপদেও স্বস্তির নিঃশ্বাস– ফেললো। বললো ফুল্লরা–জাভেদ, হয়তো আমরা আর কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবো না। তবু আমার দুঃখ নেই, কারণ একসঙ্গে তুমি আর আমি মৃত্যুবরণ করবে।

আমি মরতে চাই না ফুল্লরা, আমি বাঁচতে চাই।

তোমার কণ্ঠ আমাকে বেশি ব্যথিত করছে জাভেদ। এত কাছে পেয়েও তোমাকে পাইনি মনে হয়। সত্যি ওরা কত হৃদয়হীন, তোমার প্রতি একটুও মায়া হলো না।

আমার প্রতি মায়া!…তোমার প্রতিও তাদের করুণা হলো না, আর করুণা করবেই বা কেন, তারা তো আমাদের হত্যা করবার জন্যই বন্দী করেছে….।

শুধু তাই নয়, আমাদের কিভাবে কোথায় রাখা হলো তাও আমরা জানি না। আমরা কোথায় আছি তাও জানি না। এভাবে আর কদিন বেঁচে থাকবো তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই…

জাভেদ বললো—-আর বেশিক্ষণ আমরা বাঁচবো বলে কোনো ভরসা নেই ফুল্লরা। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও….

জাভেদ, তুমি এত সুন্দর কথা বলতে পারো। আগে কেন বলোনি? কেন বুঝতে চাওনি আমার মনের কথা…ফুল্লরার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ দুর্বল।

আর কতক্ষণ তারা এভাবে বাঁচতে পারে। প্রচন্ড ঢেউয়ের বুকে বাক্সটা যখন ভেসে চলেছিলো তখন ওরা গড়াগড়ি খাচ্ছিলো এ ওর দেহের ওপর। এখন

অবশ্য তেমন কোনো, ঝাঁকুনি বোধ হচ্ছিলো না। মাঝে মধ্যে হেলেদুলে চলছিলো তাদের বাহক জলযান বাক্সটা। মাঝে মধ্যে তলিয়ে আবার ভেসে উঠছিলো।

জাভেদ বললো—আমাদের মৃত্যু যখন হবেই তখন আমরা বাক্সটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করি যা ভাগ্যে থাকে হবে।

বললো ফুল্লরা–তাই করো।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও জাভেদ আর ফুল্লরা বাক্সটা ভাঙতে সক্ষম হলো না। এ মুহূর্তে যদি হাতের কাছে কোনো কঠিন বস্তু পেতো তাহলে বাক্সটা যত মজবুত হোক ভেঙে ফেলতে পারতো কিন্তু তা পারলো না ওরা। বরং আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

ক্রমেই নিস্তেজ এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ওরা। এক সময় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো জাভেদ আর ফুল্লরা।

বাক্সটা তেমনি হেলেদুলে এগিয়ে চললো।

ওদিকে মাহবুব তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে আক্রমণ চালালো জাহাজ থেকে পলাতক স্পীডবোটটিকে। শেষ পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হলো মাহবুব ও তার সঙ্গীদ্বয়। কারণ ওরা এত স্পীডে বোটটি চালাচ্ছিলো যে, মাহবুবু কিছুতেই স্পীডবোটখানাকে আয়ত্তে আনতে পারছিলো না।

মাহবুবের সঙ্গের অনুচরদ্বয় দক্ষ ছিলো, তারা স্পীডবোটটাকে কৌশলে চালাতে লাগলো। স্পীডবোটের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে মাহবুব গুলি ছুঁড়ছে।

মাহবুবের গুলি ব্যর্থ হলো না, সামনের স্পীডবোটের একজন নিহত হলো, মুখ থুবড়ে পড়লো সে সাগরের নোনা জলে।

তবু মাহবুব গুলি চালাচ্ছে।

তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে মতিলাল আর স্পীডবোটখানা চালনা করছিলো জবরু। মাহাবুব রাইফেল চালনায় দক্ষ। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের স্পীডবোটখানাকে পাকড়াও করে ফেলতে সক্ষম হলো। বেশ কয়েকজন নিহত হলে মাহবুবের গুলি বিদ্ধ হয়ে।

মাহবুব স্পীডবোটখানা পাকড়াও করবার পূর্ব মূহুর্তে যে একজন ছিলো সেও লাফিয়ে পড়লো সাগরের পানিতে। মাহবুব ও সঙ্গীদ্বয় তাকে ধরবার চেষ্টা করলো কিন্তু গভীর জলের তলায় তলিয়ে গেলো সে।

মাহবুব বললো—যেতে দাও। ও আর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে না।

স্পীডবোটটা দখল করলো মাহবুবরা।

তারা ভালভাবে পরীক্ষা করে স্পীডবোটখানার মধ্যে একটি ব্যাগ পেলো। ব্যাগটিকে খুলে তারা দেখলো কিছু কাগজপত্র রয়েছে। এ ছাড়া আরও ছিলো কিছু অদ্ভুত ধরনের মেশিনাদি। মাহবুব তার সঙ্গীদ্বয়কে এসব তাদের স্পীডবোটে তুলে নিতে বললো।

আদেশ পালন করলে মাহবুবের সঙ্গীদ্বয়।

তখন কিছু ভাবার সময় নেই, তাই তারা দ্রুত পুনরায় ফিরে এলো তাদের ডুবু জাহাজে।

জাহাজে বসেই রহমান তাদের টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পেলো সেই বিস্ময়কর জলযানটি সাগরতলায় এগিয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ আকার একটি তিমি যানটিকে আক্রমণ করলো। বনহুর ঐখানে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই যানটিই তাকে তুলে নিয়েছে রহমান ও তার সঙ্গীগণ দেখতে পেয়েছিলো। রহমান এ কারণে কোনো আক্রমণ চালাতে দ্বিধা বোধ করছিলো।

বৃহৎ আকার তিমি মাছটির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই চলেছে। তিমি মনে করেছে জলযানটি তার কোনো শত্রু হবে। জলযানটির আকৃতি কিছুটা মৎস্যের আকার, এ কারণেই হয়তো তিমি তার শত্রু মনে করে আক্রমণ করে বসেছে।

তিমিটা বার বার টক্কর দিচ্ছে জলযানটার সঙ্গে। জলযানটাও পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। হঠাৎ করে রহমান দেখতে পেলো তিমিটা জলযানটির নিকটে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ দূরে সরে গেলো মৎস্যরাজ। এবার সেই জলযানটি দ্রুত এগিয়ে আসছে তাদের ডুবুজাহাজখানার দিকে।

রহমান ও তার সঙ্গীগণ অবাক হলো।

একজন বললো—রহমান ভাই, সর্দারকে এই জলযানটি তুলে নিয়েছিলো, তাই না?

হাঁ। যানটা এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো রহমান সঙ্গীদের নিয়ে। হয়তো বা জলযানটি কোনো মতলব নিয়ে এদিকে আসছে। সর্দার ঐ জলযানে আছে, কাজেই তাদের মনে একটা প্রবল উন্মাদনা জাগলো।

বিস্ময়কর বটে জলযানের দরজা খুলে গেলো, ডুবুরী পোশাকে জলযান থেকে বেরিয়ে এলো একজন, সাঁতার কেটে এগুতে লাগলো।

রহমান ও তার সঙ্গীগণ চিনতে পারলো ডুবুরী পোশাক পরিহিত ব্যক্তিই বনহুর। সর্দারকে তাহলে ওরা মুক্ত করে দিলো। সব যেন কেমন আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে রহমান ও তার সঙ্গীদের কাছে।

প্রায় জাহাজখানার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

জলযানটা ডুবুরী পোশাক পরিহিতকে উদগীরণ করে স্পীডে সরে যাচ্ছে সাগর তলদেশ দিয়ে। স্পষ্ট নজরে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবুজাহাজে প্রবেশ করলো বনহুর।

রহমান ও তার সঙ্গীগণ এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। সবার মুখে খুশিভরা প্রসন্ন ভাব। কুর্ণিশ জানালে তারা বনহুরকে। সবার মনে প্রশ্ন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহসী হচ্ছে না।

বনহুর ডুবুরী পোশাক খুলে ফেললো।

কোনো কথা না বলে ফিরে এলো সেই কক্ষে যে ক্যাবিনে ছিলো টেলিভিশন ক্যামেরার সুইচ এবং পর্দা। বনহুর সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো সেই জাহাজখানা। যে জাহাজখানার তলদেশ ফাঁসিয়ে দিয়ে রহমান নরপশুদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। জাহাজখানা গভীর জলের তলায় আশ্রয় নেয়ার জন্য উল্টেপাল্টে এগিয়ে যাচ্ছে আরও গভীরে।

বনহুর রহমানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো— রহমান, এবার তোমার কৃতিত্ব। তুমি ঠিকভাবে কাজ করেছে, জাহাজখানার তলদেশ ফাঁসিয়ে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছো– নইলে ওরা যেভাবে জাহাজ থেকে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছিলো তাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিলো ভীষণ।

বললো রহমান—হাঁ সর্দার, আমি এ কারণেই মূহর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি জানতাম তুমি একটা হাত হারালেও অক্ষম নও। ঠিক কৌশলে কাজ করেছ।

রহমান বললো—সর্দার, শত্রুদের জাহাজ ধ্বংস করতে পেরে আমিও খুশি হয়েছি, তারপর যারা জাহাজ থেকে স্পীডবোটে নেমে পালাচ্ছিলো মাহবুব তাদেরকেও খতম করেছে। শুধু একজন সাগরের বুকে লাফিয়ে পড়ে তলিয়ে গেছে…জানি না সে জীবিত আছে না মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুর বললো—ঐ জাহাজখানার তলদেশে আমরা একটি বাক্স অথবা ঐ ধরনের একটি বস্তু দেখতে পেয়েছিলাম যা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলো।

হাঁ সর্দার, সেই ঝুলন্ত বস্তুটিকে জাহাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিলো…..

আমি তা লক্ষ করেছিলাম। জানতে চাই বস্তুটি সম্বন্ধে কোনো কিছু জানো কি না?

সর্দার, আমরা টেলিভিশন পর্দায় লক্ষ করেছি সেই বিস্ময়কর বস্তুটি জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ঢেউয়ের বুকে ভাসতে ভাসতে বহুদূর চলে গেছে…….

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

রহমান সর্দারের মুখোভাব লক্ষ করছিলো, সে বুঝতে পারলো ঐ বস্তুটি সর্দারকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওটার মধ্যে কি ছিলো যা তারা জাহাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে রহমান ও তার দলবলের মনে। সর্দারকে যে যানটি সাগরতল থেকে পাকড়াও করেছিলো কারা তারা। কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাকড়াও করেছিলো আবার তাকে জাহাজে পৌঁছে দিয়ে গেলো সব যেন কেমন লাগছে তাদের কাছে।

বলরো রহমান–সর্দার, আপনার ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক লাগছে আমাদের কাছে।

হাঁ, রহস্যজনক বটে। সেই বিস্ময়কর রহস্যময়ী নারী-তারই জলযান ছিলো সেটা। একটু থেমে বললো বনহুর—ঐ জাহাজ থেকে যখন অবিরাম অগ্নিগোলা আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো তখন আর একটা বিপদে আটকা পড়লাম। তোমরা আমাদের টেলিভিশন পর্দায় হয়তো লক্ষ করে থাকবে....

সর্দার, ওরা অভিনয় উপায়ে আপনাকে লৌহজাল দ্বারা বেষ্টন করে ফেলেছিলো। গভীর সাগরতলে আপনি জাল বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি জলযান এসে আপনাকে তুলে নিয়েছিলো, এ সবই আমরা লক্ষ করেছি সর্দার......

হাঁ, ঐ জলযানটির চালক ছিলো সেই জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি। জানি না কে সে আর কোথা হতেই বা হলো তার আবির্ভাব। জলযানটি আমার নিকটবর্তী হতেই ভেতরে কিছুটা নজরে পড়লো আমার, কারণ জলযানটির সামনের ভাগ পুরু কাঁচ জাতীয় শক্ত কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি ছিলো। দেখলাম একটি জমকালো পোশাক পরিহিত লোক বসে আছে চালকের আসনে।

সর্দার তারপর? রহমান দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে শুনছিলোতার কথা। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, সহচরগণ। তাদের চোখেমুখেও বিস্ময়কর ভাব ফুটে উটেছে। একাগ্রচিত্তে শুনছিলো তারা।

বলে চলেছে বনহুর—যানটি অত্যন্ত দ্রুত আমার পাশে এলো এবং আমাকে যানে তুলে নিলো। আমি চিনতে পারলাম এই সেই নারী যে আমাকে বি, কে চৌধুরীর দুর্গম কারাকক্ষ হতে মুক্ত করে এনেছিলো আমাকে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানালাম তাকে কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না তার কাছ থেকে। তারপর সে আমাকে আমার ডুবুজাহাজে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

সর্দার, কে সেই নারী যার আচরণ বিস্ময়কর?

এ প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছে কিন্তু এত কাছেও আমি তাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয় আমি তাকে কোথাও দেখেছি-একটু ভেবে নিজেকে ফিরিয়ে আনলো বনহুর পূর্বের কথায়। বললো—সে, সেই বাক্সটি যা

জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিলে ঐ বাক্সটিকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। ওর মধ্যে এমন কোনো বস্তু আছে যা আমাদের অজানা রয়েছে।

আমাদের মনেও এই ধরনের সন্দেহ জাগছে। কিন্তু আমরা কি আর সেই বাক্সটি খুঁজে পাবো সর্দার? বিশাল সমুদ্রবক্ষে বাক্সটি কোথায় ভেসে গেছে কে জানে।

তোমরা আমাদের ডুবুজাহাজখানাকে এগিয়ে নেবার জন্য চালকদের বলে দাও। আমরা সাগরবক্ষে সন্ধান চালিয়ে শেষ চেষ্টা করবো, বাক্সটি পাওয়া যায় কিনা।

রহমান বললো–হাঁ সর্দার, আমরা সন্ধান চালিয়ে যাবো যতক্ষণ সেই বাক্সটি আবিষ্কার করতে সক্ষম না হবো। কিন্তু বি, কে চৌধুরীর দল তো আবার হামলা চালাবে না?

তা চালাতে পারে, কারণ বি, কে চৌধুরীর দল শুধু একস্থানে নেই তার সাঙ্গপাঙ্গ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তারা হামলা চালালে আমরাও প্রস্তুত আছি।

হাঁ সর্দার, এ ব্যাপারে আমরা সর্বক্ষণ প্রস্তুত।

সাবাস, তাহলে তোমরা এগিয়ে চলল।

ডুবুজাহাজখানা কান্দাই সাগরের তলদেশ বেয়ে বৃহদাকার জলজীবের মতো এগিয়ে চললো।

বনহুর তার বিস্ময়কর পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দিকদর্শন মেশিনের পাশে যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

*

গভীর রাত।

নূর তার অফিস কক্ষে বসে কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছিলো। দেয়ালঘড়িটা টিক টিক শব্দে বেজে চলেছে। বেশ কিছুদিন হলো শহর থেকে লোক অপহরণ হচ্ছে, তাদের নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ মহলে অনেক প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে কেউ তার হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। মিঃ শঙ্কর রাও এ ব্যাপারে নূরের সাহায্য কামনা করেছেন।

মিঃ শঙ্কর রাওয়ের বয়স হলেও তিনি এখনও এসব ব্যাপারে উৎসাহী। মিঃ হারুনও এই রহস্য ঘটনা নিয়ে খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছেন।

দুই গোয়েন্দা প্রধান এসেছিলেন নূরের কাছে। এই রহস্যজনক নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করেছিলেন তাঁরা নূরের সঙ্গে। কিছু কাগজপত্রও তারা দিয়ে গেছেন নূরকে–যদি তার কাজে আসে এগুলো।

কাগজপত্রগুলো কিছু লোকের নাম ও ঠিকানা। তারা কে কি করতো, কেমন অবস্থার লোক, কোথা থেকে নিখোঁজ হয়েছে, কতদিন হতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মীয়স্বজন কোথায় আছে—সবকিছু বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে।

নূর এসব নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছিলো এবং ভাবছিলো অনেক কিছু। তার কানের কাছে মিঃ শঙ্কর রাও এর একটি কথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে মিঃ… জামান, এই রহস্যজনক উধাও ব্যাপারের সমাধান আপনি করতে পারবেন যা আমাদের দ্বারা সম্ভব হলো না

একবার নূর তাকালো দেয়ালঘড়ির দিকে। রাত তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। কিছু কিছু কাগজ থেকে কিছু নোট করে নিচ্ছিলো নূর নিজের ডায়রীতে।

টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। নূর রিসিভার তুলে নিলো-হ্যালো…স্পিকিং নুরুজ্জামান।

ওপাশ থেকে শোনা গেলো একটি ভারী কণ্ঠস্বর…নুরুজ্জামান এতরাতেও জেগে কাজ করছেন নিশ্চিত মনে কিন্তু আপনি জানেন না আপনার কতবড়ো সর্বনাশ হয়েছে…

সর্বনাশ, আমার? …কিছুটা অবাক কণ্ঠে বললো নুর।

ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর...হা আপনার...আপনি যখন শহরের এবং শহরতলির অসহায় মানুষগুলোর নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন তখন আপনার...বলবো?

বলো? বলো,...কে তুমি?...

আমি যেই হই তোমার বাবার শত্রু কিন্তু তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এই রহস্যজনক ঘটনা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেও না...

একেবারে অচেনা কণ্ঠস্বর। ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নূর।

ওপাশ থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর–যেকথা বলতে চাই তার কিছুটা জেনে রাখোতোমার বাবাকে তুমি যদি হত্যা করতে পারো অথবা বন্দী করে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো তাহলে তুমি সুখে শান্তিতে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে পারবে নচেৎ...

...বলল তারপর?...বললো নূর।

...যদি আমার কথা না রাখো তাহলে...শুধু তোমাকে নয়, তোমার মা মনিরাকে আমরা...সরিয়ে...ফেলবো...এবং তার ওপর চালাবো কঠিন নির্যাতন...

অসম্ভব! পারবে না...আমার মার ওপর তোমরা কোনো রকম কিছু করতে পারবে না...

অট্টহাসির শব্দ।

নূর রিসিভার রেখে দিলো সশব্দে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পুনরায় ফোন বেজে ওঠে ক্রিং ক্রিং শব্দে।

নূর কিছুক্ষণ বিলম্ব করলো।

তবু ফোন বেজেই চলেছে একটানা।

নূর অগত্যা রিসিভার তুলে নিলো হাতে, হ্যালো—

সেই কণ্ঠস্বর…নূরুজ্জামান, রিসিভার রেখে দিয়েই নিস্তার পাবে না, কারণ যা ঘটবার ঘটেই গেছে…আমরা তোমার মা মিসেস মনিরাকে তুলে নিয়ে এসেছি…

নূর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে বললো—-……কি বললে? আমার মাকে তোমরা…

…হাঁ তোমার মা মিসেস মনিরা বেগম এখন আমাদের গোপন আস্তানায় আটক…।

…মিথ্যা কথা…এ কখনও হতে পারে না…

…যা হয়েছে তা হতে না পারার কিছু নেই…আমাদের লোক তাকে তার শোবার ঘর হতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে এনেছে…

…অসম্ভব…

..সম্ভব হয়েছে…

…না না, বিশ্বাস করি না…

…সংবাদ নিয়ে দেখতে পারো…তবে হাঁ, তাকে আমরা অতি সাবধানে রাখবো…সম্মানের সঙ্গে…যদি তোমার বাবাকে আমাদের হাতে তুলে দাও তাহলে তোমার মায়ের মুক্তি…নইলে তোমার মায়ের মৃতদেহ পাবে তারই শয্যায়…… যেভাবে আমরা তাকে নিয়ে এসেছি ঠিক সেইভাবেই আমরা তাকে রেখে আসবো…

ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

নূর নিজের কান থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখে পুনরায় রিসিভার তুলে নিয়ে চৌধুরীবাড়িতে ফোন করলো। ওপাশে ফোন বেজেই চলেছে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নূর অধৈর্য হয়ে উঠলো, প্রথমে সে অজ্ঞাত ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু এ মুহূর্তে মনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগলো। তাহলে কি ব্যাপারটা সত্য? টেলিফোনটা রয়েছে মায়ের কক্ষে, তবে কি……রিং হচ্ছে একটানা।

ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে নূরের।

যা সে কোনোদিন কল্পনা করেনি, ভাবতেও পারেনি তার মায়ের ওপর এমন কোনো বিপদ আসতে পারে তাই হলো। না না, এ হতে পারে না। নূর কাগজপত্রগুলো এলোমেলোভাবে ড্রয়ারে উঠিয়ে রাখলো দ্রুতহস্তে, তারপর অপর ড্রয়ার খুলে বের করলো তার রিভলভারখানা। নূর তার রিভলভারে সব সময় গুলি ভরে রাখতো, কখন কোন্ মুহূর্তে রিভলভারখানা কাজে লেগে যায় কে জানে।

নূর রিভলভারখানা প্যান্টের পকেটে রেখে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। গাড়িখানা বের করে গাড়ি বারান্দায় নিয়ে এলো, তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো বাংলো থেকে।

জনহীন রাজপথ।

নূর আপন মনে ড্রাইভ করে চলেছে।

লাইটপোষ্টের আলোগুলো এক একবার গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেই দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে। ভাবছে কত কথা, সত্যি কি বাসায় গিয়ে মাকে দেখতে পাবে না? সত্যি, কি মাকে দুস্কৃতিকারিগণ তুলে নিয়ে গেছে তার শয্যা হতে? না না, তা-কি করে হবে? তার মা সাধারণ মহিলা নয়। তার মা স্বয়ং দস্যু বনহুরের স্ত্রী, সত্যি কি তার আব্বু এখনও নিখোঁজ। তার মাকে নরপশু শয়তানরা ধরে নিয়ে গেলো অথচ তার আব্বু কিছু জানে না এ ব্যাপারে সে জানে তার আব্বুর অসাধ্য কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তার কাজ। তারা কারা, যারা তার আব্বুকে চায়, নইলে তার মায়ের ওপর চালানো হবে কঠিন নির্যাতন-নূর দাঁতে দাঁত পিষে আপন মনে উচ্চারণ করলো, আমার আব্বুকে পাকড়াও করতে না পেরে তোমরা আমার মায়ের ওপর নিষ্পেষণ চালাবে, তা কোনোদিনই হতে দেবো না আমি

অনেক চিন্তা জট পাকাচ্ছে নূরের মাথার মধ্যে।

এলোমেলো ভাবনা। এত স্পীডে চালিয়েও গাড়িখানা যেন এগুতে পারছে না। পথ যেন বেড়ে গেছে অনেক।

এক সময় বাড়ির নিকটে পৌঁছে গেলো নূর তার গাড়ি নিয়ে। সে জানে বেশ কিছুদিন হলো পুলিশমহল তাদের বাড়ির ওপর নজর রাখা ছেড়ে দিয়েছে। এক সময় গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়াও কান্দাই পুলিশবাহিনী কড়া নজর রাখতে এ

বাড়িখানার দিকে। কারণ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সজাগ ছিলো তারা, অবশ্য এখন পুলিশমহল কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, কারণ, বেশ কিছুদিন কান্দাই শহরে বনহুরের আবির্ভাব ঘটেনি।

পুলিশমহল নূরকে এ ব্যাপারে কিছু অবগত না করলেও নূর গোপন সূত্রে সব জেনে নিয়েছিলো এবং সে কারণেই নূর ইচ্ছাপূর্বক অন্য বাসায় থাকতো। তার কাজে যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

নূর বাড়ির সামনে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, দেখলো বাড়ির গেট খোলা। গেটের পাশে দারোয়ান নেই। গাড়িসহ নূর বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, দ্রুত প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে।

এখানেও দরজা খোলা রয়েছে।

গভীর রাত।

বাড়িখানা ঘুমন্তপুরী বলে মনে হচ্ছে।

বাড়ির ভেতরে হলঘরে প্রবেশ করে কাউকে দেখতে পেলো না নূর।

অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিলো না, কারণ নূর পূর্বেই অনুমান করে নিয়েছিলো টেলিফোনে যা বলা হলো তা সত্যই হবে। নইলে সদর গেট এভাবে ভোলা থাকতো না। নূর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো। আরও আশ্চর্য হলো যখন দেখতে পেলো তার মায়ের কক্ষের দরজা খোলা।

নূর কোথাও বাধা পায়নি, গেট খোলা ছিলো, দারোয়ান নেই। হলঘর খোলা, হলঘরের মধ্যে কেউ নেই। সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ না। সোজা সে ওপরে উঠে দেখলো তার মায়ের ঘরের দরজা খোলা।

দ্রুত প্রবেশ করলো নূর মায়ের কক্ষে। শয্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে ডাকলো নূর–আম্মু, আম্মু, আম্মু তুমি কোথায়। আম্মু, তুমি কোথায়? কোনো সাড়া এলো না।

পাশের ঘরে ছুটে গেলো নূর, দাদীমার বিছানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো–তিনি বিছানায় শায়িত রয়েছেন। নূর ক্ষিপ্তের মত বিছানার পাশে গিয়ে মশারি

তুলে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো–দাদীমা, দাদীমা

কিন্তু আশ্চর্য, মরিয়ম বেগম যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। নূর ছুটে গেলো সরকার সাহেবের ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলো নূর...সরকার দাদু, সরকার দাদু, দরজা খোলেন, দরজা খোলেন...

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ঘরে কেউ আছে বলে মনে হলো না।

নূর বুঝতে পারলো সরকার দাদুও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যস্ত সমস্তভাবে চাকরবাকরদের সন্ধান নিলো। আশ্চর্য হলো নূর, সবাই যে যার শয্যায় অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত রয়েছে। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে একজনকেও নূর জাগাতে পারলো না। আবার ফিরে এলো সে মায়ের কক্ষে।

ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হলো নূরের।

কিন্তু কাঁদতে পারলো না। সে বেশ অনুভব করলো কেউ তাকে লক্ষ্য করছে তার অজ্ঞাতে। কিন্তু তারা কারা?

নূর টেলিফোনের পাশে এসে দাঁড়ালো, পুলিশ অফিসে ফোন করবে কি? এমন একটা ঘটনা যা বলতে তার দ্বিধা লাগছে। আব্বুকে তুলে দিতে হবে সেই অজ্ঞাত শত্রুর হাতে, নইলে তার আম্মুর আশা ত্যাগ করতে হবে...নূর বসে পড়লো চেয়ারে, ভাবতে লাগলো এখন কি করা তার কর্তব্য। পুলিশমহলে জানানোটা কি তার উচিত হবে। দস্যু বনহুর তার আব্বু, এ কথা পুলিশমহলের কর্মকর্তাদের অজানা নেই। কেমন যেন সব এলোমেলো লাগছে...

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো।

নূর রিসিভার তুলে নিলো। কিন্তু কোন শব্দ করলো না।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর-নুরুজ্জামান, ভেবে কোনো ফল হবে না, আমার কথামত তোমাকে কাজ করতে হবে নইলে...ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

নূর রিসিভার নামিয়ে রাখলো, ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার।

শত্রু যেই হোক অত্যন্ত চতুর, কৌশলে বাড়ির সবাইকে সংজ্ঞাহীন করার পর তার আম্মুকে তুলে নেয়া হয়েছে…না জানি কোথায় তিনি কি অবস্থায় আছেন… নূর আর ভাবতে পারে না, সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিন্তাধারাগুলো কি করবে এখন সেঃ নূর মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলো। বার বার নিজের অজ্ঞাতে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে মায়ের বিছানার, দিকে। মাকে ওরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি ভাবে তাকে নিয়ে গেলো? কোথায় তাকে রাখা হয়েছে? এতক্ষণে তার আম্মুর কি সংজ্ঞা ফিরে এসেছে না সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে কে জানে?

হঠাৎ নূরের দৃষ্টি মায়ের বিছানার একপাশে এসে স্থির হলো। একটি রুমাল পড়ে আছে সেখানে। নূর এগিয়ে গিয়ে রুমালখানা হাতে নিতেই একটা গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো সে বুঝতে পারলো রুমালখানায় ক্লোরোফরম মাখানো আছে।

নূর রুমালখানা প্যান্টের পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। উদাস চোখে তাকালো সে পাশের জানালা দিয়ে অন্ধকারময় আকাশের দিকে।

*

সংজ্ঞা ফিরে এলো মনিরার।

ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসলো, ভাবতে চেষ্টা করলো কোথায় এখন সে। মনে পড়লো, হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো মনিরার। চোখ মেলে তাকাতেই তার বিছানার পাশে দুটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছিলো, তারা আচমকা একখানা রুমাল অথবা রুমালজাতীয় কিছু নাকে চেপে ধরেছিলো তার। এরপর আর কিছু মনে নেই মনিরার। শয্যায় উঠে বসতেই তার কানে ভেসে এলো একটি নারী কণ্ঠস্বর।–আপনি এখন বন্দিনী, এই কক্ষ আপনার বাসস্থান, এখান থেকে বের হতে পারবেন না কোনোদিন……

মনিরা ফিরে তাকালো, দেখতে পেলো একটি অর্ধবয়স্ক মহিলা তার শয্যার অদুরে বসে আছে। সামনে একটি মোমবাতি জ্বলছে।

মোমর আলোতে যতটুকু দেখা যায় বেশ বুঝতে পারলো কক্ষটি ছোট এবং স্যাঁতসেতে ধরনের। তার শয্যাটি মেঝেতে পাতা রয়েছে, সামান্য বিছানা মাত্র। একটা কেমন ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসছে মনিরার।

মহিলাটি অর্ধবয়স্ক হলেও বেশ শক্ত বাঁধনের চেহারার।

এবার সে এগিয়ে এলো।

মনিরার পাশে এসে বললো—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না এখানে। আপনার দেখা শোনার দায়িত্বভার আমার ওপরে দিয়েছেন বড় সাহেব।

বড় সাহেব।

হাঁ

কে তোমাদের বড় সাহেব? কি তার নাম?

ওসব বলা যাবে না।

আমাকে তোমরা কেন এভাবে বন্দী করে রাখছে? কি উদ্দেশ্য তোমাদের বলবে? বললো মনিরা।

মহিলাটি বললো—-আমি কিছু জানি না। আপনাকে দেখাশোনার জন্য আমাকে এখানে থাকতে বলা হয়েছে।

এটা কোন জায়গা।

তাও জানি না।

কোথায় এ স্থান তাও জানো না?

না। এখানে যখন আমাকে আনা হলো তখন আমার চোখ বেঁধে আনা হয়েছে, পথ আমি দেখিনি।

তাহলে তুমিও তো বন্দী।

না, আমি বন্দী হব কোন্ দুঃখে।

আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে যেতে পারবে?

তা পারবো না। আমাকে এখানে নিয়ে আসার সময় চোখ বেঁধে এনেছে, তাই আমি পথ চিনি না।

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার মত অভিনয় করে বললো–হায় ভাগ্য, আমার সঙ্গে তোমাকেও ওরা বন্দী করেছে কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো তোমার বড় সাহেবের নাম কি?

বড় সাহেব আমাদের হবে কেন, বড় সাহেব অফিসের বড় সাহেব। তাই তাকে সবাই বড় সাহেব বলে ডাকে। আমরাও ডাকি..

তিনি থাকেন কোথায়? তার নাম কি?

কোথায় থাকেন কি নাম কিছু জানি না।

মনিরা মোমের আলোতে ভালভাবে তাকালো মহিলাটির মুখের দিকে। ঐ মুখে কোনো শয়তানি আছে বলে মনে হলো না। তাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে ঠিক সেইভাবেই কাজ করছে।

মহিলা বললো–আপনি কিছু খাবেন?

মনিরা জানে না কতক্ষণ সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলো, বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে সে। বললো—দাও খাব!

মহিলা বেরিয়ে গেলো একটু পরে থালায় কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এলো।

মনিরার সামনে রেখে বললো–নিন, খেয়ে নিন।

কোনো আপত্তি না করে খেতে শুরু করলো মনিরা। সে অনুধাবন করলো যে ব্যক্তিই তাকে বন্দী করে আনুক না কেন নিশ্চয়ই তার কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাকে জীবিত থেকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে কি তাদের উদ্দেশ্য। না জানি নূর এতক্ষণ তার এই বিপদের কথা জানতে পেরেছে কি না। যদি জেনে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে খোঁজ করতে শুরু করেছে।

খেতে খেতে ভাবছিলো মনিরা অনেক কথা।

মহিলা তার জন্য যে খাবার এনেছে তা সত্যি সুন্দর আর সুস্বাদু। এমন খাবার এখানে এলো কি করে। উন্নত শ্রেণীর খাবার, তৃপ্তি সহকারে খেলো মনিরা। কিন্তু মন তার বড় অস্থির লাগছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে তার। এ কি! তবে কি খাবারের সঙ্গে কোনো ওষুধ মেশানো ছিলো। মাথাটা মনিরার ঝিম ঝিম করে চলেছে, চোখ দুটো মুদে আসছে তার……আর বসতে পারছে না, ঢলে পড়লো মনিরা শয্যায়।

[পরবর্তী বই মনিরার মুক্তি]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০২ হাংহার রহস্য

পরবর্তী:

৮.০৪ মনিরার মুক্তি »